

# PRABANDHA-PRASUN.

***Typical Selections from Bengali Literature 1830-1905.***

EDITED WITH INTRODUCTION AND NOTES

BY

UPENDRA CHANDRA RAHA.

*Assistant Secretary, Tippera Branch of the Bangiya Sahitya-Parishat; Teacher, Comilla Victoria Collegiate School.*

# প্রবন্ধ-প্রসূন

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র রাহা-সম্পাদিত।

১৯১৯।

মূল্য বার আনা।

PUBLISHED BY
**Nagendra Kumar Roy,**
City Library,
*Dacca and Calcutta.*

PRINTED BY
**S. A. Gunny,**
*at the Alexandra S. M. Press*
**Dacca.**

## প্রবন্ধ-প্রসূনের বিশেষত্ব।

প্রবন্ধ-প্রসূন বঙ্গবাণীর প্রসূনিত পূজা-প্রাঙ্গণ হইতে আহৃত কতিপয় কমনীয়কুসুম-শোভিত পুষ্পপাত্র। ইহা পাঁচটি বিভিন্ন স্তবকে সজ্জিত। প্রথম চারি স্তবকে অন্যূন পঞ্চবিংশ জন সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্য-সাধকের অমৃতময়ী লেখনী-প্রসূত ৩০টি গদ্য প্রবন্ধ এবং পঞ্চম স্তবকে অন্যূন দ্বাদশ জন প্রসিদ্ধ কবির মানসোদ্যানজাত ১৬টি কবিতা-কুসুম সমাহৃত হইয়াছে। এই সকল প্রবন্ধ ও কবিতা বিষয়-বৈচিত্র্য, ভাবৈশ্বর্য্য, শব্দ-সম্পদ, বর্ণনার মাধুর্য্য, গাম্ভীর্য্য, ওজস্বিতা ও কমনীয়তা এবং রুচির বিশুদ্ধিতায় সর্ব্ববিধ রচনার সর্ব্বোৎকৃষ্ট আদর্শস্থানীয়।

যে সকল সাহিত্য-সেবক ১৮১১ হইতে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী কালে জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ১৮ জন মৃত ও ১৮ জন জীবিত লেখকের রচনা পৌর্ব্বাপর্য্যানুসারে যথাক্রমে বিভিন্ন স্তবকে বিন্যস্ত হইয়াছে। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের পরিপুষ্টি, প্রসার ও বৈচিত্র্যময় ক্রমবিকাশের সুস্পষ্ট ধারাবাহিকতা প্রদর্শনই এইরূপ কালবিভাগানুযায়ী প্রবন্ধ-বিন্যাসের উদ্দেশ্য।

প্রতি স্তবকের প্রারম্ভে সেই স্তবকের অন্তর্গত প্রবন্ধ সমূহের আলোচ্য বিষয়, রচনা-ভঙ্গী এবং ভাষা ও ভাবগত বিশেষত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

যে সকল স্থলে পূর্ব্ববর্ণিত বিষয়ের অবতারণা ব্যতীত উদ্ধৃতাংশ স্পষ্টরূপে বোধগম্য হওয়া দুরূহ, সেই সকল স্থলে বোধ-সৌকর্য্যার্থে প্রবন্ধের শীর্ষদেশে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রসঙ্গের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রতি প্রবন্ধেই প্রত্যেক অনুচ্ছেদের বিষয়জ্ঞাপক সার-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। এই সকল সূচীর প্রতি দৃষ্টিমাত্রেই প্রবন্ধোক্ত বিষয়ের মর্ম্মোপলব্ধি হইবে।

নির্ব্বাচিত রচনাসমূহ সকল ধর্ম্মের ও সকল শ্রেণীর পাঠকগণের উপযোগী ও উপভোগ্য এবং হিন্দু ও মুসলমান-জীবনের বিবিধ চিত্তরঞ্জক চিত্রসমন্বিত।

ধর্ম্মবিষয়িণী শিক্ষা ব্যতীত কোন শিক্ষাই সার্থকতা লাভ করিতে পারে না; এজন্য গ্রন্থশেষে একটি সার্ব্বজনীন প্রার্থনা উদ্ধৃত হইয়াছে।

বিবিধ জ্ঞাতব্য তথ্যসমন্বিত টীকা, চিত্র-সম্পদ এবং লেখক ও বিষয়ানুক্রমিক সূচী এই গ্রন্থের অপর বিশেষত্ব।

---

# বিষয়ানুক্রমিক সূচী।

# CLASSIFIED CONTENTS.

## গদ্যভাগ। Prose.

## ৩। চরিত্রগত বিশেষত্ব—
## Special Traits of Character.



## ৪। দেশ ও জাতি—সমাজ ও উৎসব—
## Place and People—Society and Festivity.

# লেখকানুক্রমিক সূচী।

## গদ্যভাগ।

# পদ্যভাগ। Poetry.

## ৪। নীতি কবিতা—Didactic Poems.

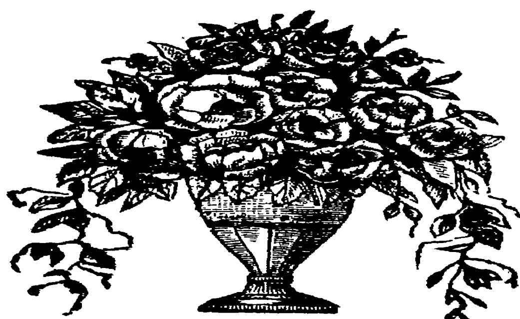
## ৫। ইতিবৃত্ত – History.



## ৬। উপন্যাস ও উপাখ্যান - Fiction.



# প্রথম স্তবক।



## প্রবন্ধ-পরিচয়।

### চরিত্র-নীতি—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

এই প্রবন্ধে চরিত্র-গঠন সম্বন্ধে কতিপয় সারগর্ভ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার ভাষা স্থানে ২ প্রাচীন রচনা-রীতির অনুযায়ী এবং অনুপ্রাস-লীলায়িত হইলেও সরল, সরস ও স্বচ্ছন্দগতি।

### সক্রেটিস—অক্ষয়কুমার দত্ত।

এই প্রবন্ধে সুবিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসের জীবনের আংশিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা প্রথমে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। ভাষার প্রাঞ্জলতা ও লেখকের চরিত্র-চিত্রণ-নৈপুণ্যে প্রবন্ধটী সাতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

### সীতার মাতৃত্ব ও পাতিব্রত্য—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

এই প্রবন্ধ বিশ্বস্রাবী করুণায় অভিষিক্ত 'সীতার বনবাস' নামক অপূর্ব্ব গদ্যকাব্যের পঞ্চম পরিচ্ছেদ হইতে সঙ্কলিত। এই গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদের অধিকাংশ মহাকবি ভবভূতি-প্রণীত 'উত্তরচরিত' নাটকের প্রথম অঙ্ক হইতে পরিগৃহীত, এবং দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ 'রামায়ণে'র উত্তরকাণ্ড অবলম্বনে রচিত হইয়াছে।

### আলস্য—দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

এই প্রবন্ধে আলস্যের অপকারিতা প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

### তপোবন—তারাশঙ্কর তর্করত্ন।

এই প্রবন্ধ কবিবর বাণভট্ট-বিরচিত 'কাদম্বরী' নামক সুললিত সংস্কৃত গদ্য-কাব্যের আখ্যানভাগ অবলম্বনে প্রণীত 'কাদম্বরী'র উপক্রমণিকাভাগ হইতে সঙ্কলিত। এই গ্রন্থ সরস পদ-লালিত্য, বর্ণনা-বৈচিত্র্য ও কলা-নৈপুণ্যের সমাবেশে অতীব উপাদেয় হইয়াছে। তপোবনের বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে প্রাচীন ঋষিজনসেবিত, তপস্যাপূত, শান্তরসাস্পদ আশ্রমপদের একটি জীবন্ত চিত্র মানসনয়ন-সমক্ষে প্রতিভাত হইয়া উঠে।

### প্রাচীন মিসর—রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই প্রবন্ধ 'টেলিমেকস্' নামক সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী উপাখ্যানের বঙ্গানুবাদ 'টেলিমেকস্' হইতে গৃহীত। ইহাতে প্রাচীন মিসরের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার ভাষা সরল ও সংযত।

---




**জগতের প্রিয়কার্য্য সাধন—বিধাতার অভিপ্রায়**

যদি জগতে যাবতীয় সুখসম্ভোগের অভিলাষ হয়, তবে জগতের প্রিয় হও। জগতের প্রিয় হইবার নিমিত্ত যে সকল প্রিয়কর্ম্মের প্রয়োজন হয়, প্রিয়জন হইয়া তাহাই কর। তুমি জগতের প্রিয় হইতে পারিলেই জগদীশ্বরের প্রিয় হইতে পারিবে। করুণাময় জগন্নাথের প্রধান অভিপ্রায় এই যে, জীবমাত্রেই তাঁহার নিয়মানুসারে হিতকর কার্য্যে নিয়ত নিযুক্ত থাকিবে, এবং তাঁহার নিয়োজিত নির্ম্মল নিয়মপালন-পূর্ব্বক সমুদয় ইন্দ্রিয় সহিত শরীর ও জন্ম সার্থক করিবে।

**অপরের শুভকামনা—অন্যের সহিত সমসুখদুঃখানুভব**

তুমি যেমন আপনার সম্মান, আপনার সম্ভ্রম, আপনার সুখ, আপনার স্বাস্থ্য ও আপনার মঙ্গল প্রার্থনা কর, সেইরূপ এই সংসারে আপনার ন্যায় সমভাবে সকলের সুখ, সকলের স্বাস্থ্য ও সকলের মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি কর। তুমি যেমন আপনার সুখে আপনি সুখী, আপনার দুঃখে আপনি দুঃখী ও আপনার ক্লেশে আপনি ক্লিষ্ট হও, তদ্রূপ পরের সুখে সুখ, পরের দুঃখে দুঃখ ও পরের ক্লেশে ক্লেশ ভোগ কর।

তুমি যাহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিবে, সে তোমার সহিত সেরূপ ব্যবহার করিবে। তুমি যখন নয়নাগ্রে দর্পণ অর্পণ কর, তখন কিরূপ প্রতিবিম্ব দেখিতে পাও? তুমি আপনার মুখ-ভঙ্গিমা যেরূপ কর, প্রতিবিম্বের ভঙ্গিমা অবিকল সেরূপই দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব যখন তুমি আপনার দেহভঙ্গিমা-দোষে আপনিই আপনার নিকট উপহাস প্রাপ্ত হও, তখন অপ্রিয় ব্যবহারদ্বারা পরের নিকট প্রেমলাভ করিবে, ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? তুমি স্বয়ং যদি মহাশয় পদবাচ্য হওয়ার ও গৌরবযুক্ত সুসম্ভাষণ লাভের প্রার্থনা কর, তবে সমুদয় মনুষ্যকে সাধুভাবে সম্ভাষণপূর্ব্বক মহাশয় শব্দে সম্বোধন কর। তুমি যদি সকলকে প্রিয় জ্ঞান কর, তবে সকলেই তোমাকে প্রিয় জ্ঞান করিবে।

প্রিয় ও অপ্রিয় ব্যবহারের ফল

তুমি অভিমান ও অহঙ্কারের অধীন হইয়া যদি সকলকে ঘৃণা-পূর্ব্বক তাচ্ছিল্য করিয়া কুকথা উল্লেখ কর, তবে কে তোমার পদে ফুল-চন্দন দিয়া পূজা করিবে? কে তোমাকে মস্তকে তুলিয়া নৃত্য করিবে? কে তোমাকে সুজন বলিয়া সমাদর করিবে?

অভিমান ও অহঙ্কার

তুমি যাহার প্রতি এক গুণ দুর্ব্ব্যবহার করিবে, সে শতগুণে তাহার পরিশোধ লইতে ত্রুটি করিবেনা। আপনার সুখ-সম্মান কেবল আপনার ব্যবহারের উপরই নির্ভর করে। তুমি যাহার শরীরে প্রহার করিবে, সে কিছু স্বীয় করদ্বারা তোমার শরীরের সেবা করিবেনা। তুমি যাহাকে পীড়া প্রদান করিবে, যাহাকে অপমান করিবে, যাহার ধন হরণ করিবে ও যাহার মনে বেদনা দিবে, সেই ব্যক্তিই তোমাকে পীড়িত করিবে, ব্যথিত করিবে, তোমার মান-নাশ ও তোমার সর্ব্বনাশ পর্য্যন্ত করিবে। একটি প্রাচীন কথা

ব্যবহারের প্রতিদান

আছে—"আপ্ ভালা তো জগৎ ভালা।" তুমি আপনি ভাল হও তো জগৎ তোমার পক্ষে ভালই হইবে, এবং ইহার বিপরীত হইলে সমুদয় বিপরীত হইবে।

তুমি বৃহস্পতির তুল্য পণ্ডিত হও, ব্রহ্মার ন্যায় কবি হও, জনকের ন্যায় জ্ঞানী হও, কামের ন্যায় সুন্দর হও, বলির ন্যায় দাতা হও, ভীষ্মের ন্যায় বীর হও, কুবেরের ন্যায় ধনী হও, কিংবা সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি হও, যদি তোমার মনে কিঞ্চিন্মাত্র অভিমান ও অহঙ্কার থাকে, তবে সকলই বৃথা হইবে; তোমার বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, সভ্যতা, বল, বিক্রম, বিষয়, বিভব, রাজত্ব, প্রভুত্ব,—কিছুতেই কিছু করিবেনা। সমুদ্র রত্নাকর ও জলনিধি হইয়াও লবণ-দোষে সকলের ত্যজ্য হইয়াছে, চন্দ্র জগতৃপ্তিকর সুধাকর হইয়াও মৃগ-চিহ্নজন্য কলঙ্কিত হইয়াছেন, ফণী মণিধর হইয়াও গরল-দোষে সকলের অবিশ্বাসী হইয়াছে, দুর্ব্বাসা মুনি মহর্ষি হইয়াও উদর-দোষে লোকের নিকট নিন্দিত হইয়াছেন, নারদমুনি দেবর্ষি হইয়াও কোন্দল-দোষে দেবমণ্ডলে অমান্য হইয়াছেন, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির পরম ধার্ম্মিক হইয়াও অশ্বত্থামার বিষয়ে কৌশলে মিথ্যাবাক্য উচ্চারণ করাতে নরকদর্শন করিয়াছেন। অতএব তুমি পর্ব্বততুল্য উচ্চ হইলেও গর্ব্বদোষে খর্ব্ব হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। দাম্ভিকতা, ছলনা, চাতুরী, অভিমান প্রভৃতিকে শান্তি-সলিলে বিসর্জ্জন কর; হৃদয়মন্দিরে সত্যদেবের প্রতিষ্ঠা করিয়া নিষ্ঠাপূর্ব্বক দয়া, ধর্ম্ম, শ্রদ্ধা, ভক্তি, করুণা, প্রেম, বিবেক, বৈরাগ্য ইত্যাদিকে মনের ক্রোড়ে সমর্পণ কর।

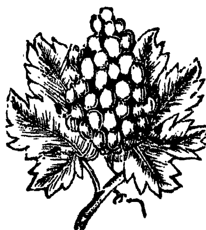
অভিমান ও অহঙ্কারের কুফল—দোষ-বর্জ্জন ও সদ্বৃত্তির অনুশীলন

তুমি যদি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হও, সিংহাসনে বসিয়া অনেকের উপর প্রভুত্ব কর, লোকে যদি তোমায় মহারাজ চক্রবর্ত্তী বলিয়া

মহাসম্ভ্রমে সম্বোধন করে, তথাপি তুমি আপনি মানুষ না হইলে মানুষে তোমায় কখনই মানুষ বলিবেনা। বড় মানুষ কি ধনে হয়? ধনের বড় মানুষ কখনই মনের বড় মানুষ নহে; ধনের মানুষ মানুষ নয়, মনের মানুষই মানুষ। আমি ধন দেখিয়া তোমাকে সমাদর করিবনা, জন দেখিয়া তোমার আদর করিবনা, সিংহাসন দেখিয়া তোমার সম্মান করিবনা, বাহুবল দেখিয়া তোমার সম্ভ্রম করিবনা, কেবল মন দেখিয়াই তোমাকে পূজা করিব। তুমি যদি স্বয়ং অমানুষ হও, অথচ দণ্ডধর হইয়া দণ্ড ধরিয়া আমাকে দণ্ড করিতে উদ্যত হও, তথাচ আমি দণ্ডভয়ে কদাচ তোমাকে দণ্ডবৎ করিবনা। কিন্তু তুমি যদি পবিত্র চিত্তে, সাধু-স্বভাবে, ভিক্ষার ঝুলি ধারণ করিয়া আগমন কর, তবে তোমার দর্শনমাত্রেই ধূলিধূসরিতাঙ্গ হইয়া পদতলে প্রণত হইব। অতএব যদি মানুষ হইবার অভিলাষ থাকে, তবে মনকে বিমল ও সরল কর। আপনি ছোট হইলেই বড় হইবে; বড় হইলে কখনই বড় হইতে পারিবেনা।

প্রকৃত মনুষ্যত্ব—প্রকৃত মনুষ্যত্বের সম্মান—মনুষ্যত্ব লাভের উপায়

(পরিবর্ত্তিত)



# সক্রেটিস্।

উদারচরিত্র, অলোকসামান্যজ্ঞানবিশিষ্ট, ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মগণের চরিত-কথা ও সৎকীর্ত্তি-শ্রবণে কাহার না কৌতূহল ও শ্রদ্ধা জন্মে? মনুষ্যের আদর্শস্বরূপ তাঁহাদের জীবনের পবিত্র সাধু দৃষ্টান্তের যে কি প্রভাব, তাহা কথনাতীত, তাহা দেশকালে বদ্ধ নহে; সহস্র উপদেশ শ্রবণে, শত শত সদ্‌গ্রন্থপাঠে যে উপকার না হয়, তাহা আমরা একটী সাধু ও মহৎ দৃষ্টান্তে প্রাপ্ত হইতে পারি।

সাধুজীবনের প্রভাব

যাঁহারা জনসমাজের উন্নতি-সাধনে আপনাদের জীবন সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা ধর্ম্মের নিমিত্ত আপনাদের সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহারা অকুতোভয়-চিত্তে বিপদরাশি অতিক্রম করিয়াও কাল্পনিক মত ও বদ্ধমূল কুসংস্কারসকলের উচ্ছেদপূর্ব্বক সত্য প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং সেই সত্যের নিমিত্ত যাঁহারা প্রাণপর্য্যন্ত দিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি আমাদের অপরিসীম কৃতজ্ঞতা-ঋণ কি কদাপি পরিশোধ হইবে? এই সকল মহাত্মা যে সময়ে, যে কোন দেশেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তাঁহারা আমাদের পূজনীয় ও চিরস্মরণীয়। যাঁহারা সত্যের জন্য, জগতের মঙ্গলের জন্য, আপনাদের জীবন সমর্পণ করিয়াছেন, যতদিন তাঁহাদের নাম পরিকীর্ত্তিত হইবে, ততদিন তাঁহাদের ইতিহাস আগ্রহের সহিত প্রচারিত ও যত্নের সহিত অধীত হইবে।

মহাত্মগণ দেশকালনির্ব্বিশেষে পূজনীয়, স্মরণীয় ও কৃতজ্ঞতাভাজন

যাঁহারা কেবল আমাদিগের ভারতভূমির পূর্ব্বতন মহাপুরুষদিগের জীবনবৃত্তান্ত শ্রবণ অথবা অধ্যয়ন করিয়াছেন, যাঁহারা গৌতমের অসামান্য

বুদ্ধিশক্তি এবং বৌদ্ধমতখণ্ডনকারী তত্ত্বজ্ঞানী শঙ্করাচার্য্যের দিগ্বিজয়ের কথা শ্রবণ করিয়াছেন, যাঁহারা শিখ-গুরু নানকের উদার স্বভাব ও হিতৈষণার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং চৈতন্যের একান্ত ভক্তি ও ধর্ম্মনিষ্ঠায় প্রীত ও চমৎকৃত হইয়াছেন, তাঁহারা এক্ষণে একজন বিদেশীয়, সামান্যবংশোদ্ভব, পরমজ্ঞানী ধর্ম্মাত্মার বিবরণ শ্রবণ করুন,—যিনি বিনীতবেশে হীনাবস্থায় থাকিয়াও স্বীয় আন্তরিক জ্যোতিতে দীপ্তিমান্ ছিলেন, যিনি সত্য-প্রেমিক হইয়া অসত্য, ভ্রম ও কুসংস্কারের বিপক্ষে একাকী দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, এবং তজ্জন্য যিনি স্বদেশীয় জনসমূহকর্ত্তৃক তাড়িত ও নিরপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, কিন্তু মৃত্যুর পর যাঁহার নাম চিরস্মরণীয় ও পৃথিবীময় পূজনীয় হইয়াছে।

ভারতের মহাপুরুষগণ—বিদেশীয় জ্ঞানী ও ধর্ম্মাত্মা সক্রেটিস

মহানুভব সক্রেটিস্ গ্রীস্‌দেশের অন্তঃপাতী এথিনি নগরের উপকণ্ঠে খৃষ্টাব্দের ৪৬৯ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়ে গ্রীকজাতি বিশেষতঃ এথিনীয়গণ মহাপ্রতাপান্বিত ও সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। এথিনি নগরে সভ্যতার চিহ্নস্বরূপ শিল্প-সাহিত্যাদির প্রচুর উন্নতি হইয়াছিল। এই সময়েই গ্রীককবি ও চিত্রকরগণ উদিত হইয়াছিলেন এবং বিবিধ বিদ্যার সমালোচনা হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। বাস্তবিক, সক্রেটিসের জীবন-বৃত্তান্ত আলোচনা করিলে, ইহা অনায়াসে বোধ হইবে যে, তিনি উদ্দেশ্য-সাধনের অনুকূল সময়েই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

সক্রেটিসের জন্ম—এথিনী ও এথিনীয়গণ

সক্রেটিসের পিতা একজন প্রস্তরখোদক ছিলেন; প্রস্তরের বিবিধ মূর্ত্তি প্রস্তুত করাই তাঁহার ব্যবসায় ছিল। সুতরাং সক্রেটিস্‌ও প্রথমে

স্বীয় পৈত্রিক ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তাহাতেও বিশেষ নিপুণতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্ম্মিত কয়েকটি প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার মৃত্যুর পর বহুশত বৎসরপর্য্যন্ত সংরক্ষিত ছিল। তাঁহার মাতা ধাত্রীর কর্ম্ম করিতেন, সুতরাং সক্রেটিসের পিতৃ ও মাতৃ উভয় কুলই সামান্য ছিল। তাঁহার সাংসারিক অবস্থাও সচ্ছল বা সুখকর ছিলনা। তাঁহার পত্নী জেন্টিপি অত্যন্ত ক্রোধপরায়ণা ও কলহকারিণী বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত ছিলেন, কিন্তু সক্রেটিস্ স্বীয় সহিষ্ণুতাগুণে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি তৎকর্ত্তৃক সাতিশয় উত্যক্ত হইলেও বিরক্তি প্রকাশ করিতেননা। এই বিষয়ের প্রমাণ-স্বরূপ জেন্টিপির একটি উক্তি ইতিহাসে প্রকটিত আছে,—"সক্রেটিস্ সর্ব্বদা যে প্রকার স্নিগ্ধভাবে গৃহে প্রবেশ করিতেন, গৃহ হইতে বহির্গমনকালে তাঁহার সেই ভাবই থাকিত।" এই স্ত্রীর গর্ভে সক্রেটিসের তিনটি পুত্র হইয়াছিল, কিন্তু ইহাদের বিশেষ কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়না।

সক্রেটিসের পিতা, মাতা ও পত্নী

সক্রেটিসের আকৃতি ও শারীরিক গঠন নিতান্ত অসদৃশ এবং সাতিশয় কদর্য্য ছিল। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় বিশাল, প্রখরতেজঃ, এবং উচ্চ ছিল, তাঁহার নাসিকা নিম্ন, ওষ্ঠদ্বয় স্থূল, পাংশুবর্ণ ও অনুজ্জ্বল ছিল। তিনি খর্ব্বকায় ছিলেন, কিন্তু তাঁহার শরীর অতিশয় হৃষ্ট, পুষ্ট এবং বলিষ্ঠ ছিল। পুরবাসিগণের মধ্যে তাঁহার তুল্য বলবান্ পুরুষ অত্যল্পই ছিল এবং তিনি বিস্তর শারীরিক কষ্ট সহ্য করিতে পারিতেন। তিনি তিনবার সামান্য পদাতিকের কর্ম্মে ব্রতী হইয়া দূরদেশে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষুৎপিপাসা ও শীতোষ্ণ এরূপ সহ্য করিতেন

সক্রেটিসের শারীরিক গঠন, সহিষ্ণুতা ও শ্রমশীলতা

যে, তাহাতে তাঁহার সঙ্গিগণ চমৎকৃত হইত। এল্‌কিবায়েদিস্‌ নামক একজন ধনাঢ্য এথিনীয় এবং সক্রেটিসের শিষ্য তাঁহার সহিষ্ণুতাশক্তির এইরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন,—"পাটিডিয়ার শিবিরে কেহই সক্রেটিসের তুল্য ক্ষুধা ও পরিশ্রম সহ্য করিতে পারিতনা। যখন অন্যলোকে প্রগাঢ় শীতে একান্ত কাতর হইয়া উষ্ণ বস্ত্রে শরীরকে আবৃত করিয়া শিবিরমধ্যে আশ্রয় লইত, তখন তিনি স্বীয় সামান্য বেশে বহির্গত হইয়া হিমশিলার উপর দিয়া অনাবৃত পদে গমন করিতেন।" কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কোন সময়েই তিনি পাদুকা ব্যবহার করিতেননা; সকল সময়েই এক প্রকার মোটা কাপড় পরিধান করিতেন, এবং তাঁহার আহারও যৎসামান্য এবং পরিমিত ছিল।

তাঁহার এই প্রকার মত ও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, মনুষ্য আপনার অভাব যতদূর স্বল্প করিতে পারিবে, ততই দেবতাদিগের নিকটতর হইবে; কারণ, অভাবই দুর্ব্বলতা ও অপূর্ণাবস্থার লক্ষণ। দেবতাগণ পূর্ণস্বরূপ, সুতরাং তাঁহাদের অভাব নাই। এই হেতু যাহাতে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ও সাংসারিক অভাব সকল ক্রমে সংক্ষিপ্ত হইয়া আইসে, তজ্জন্য তিনি একান্ত চেষ্টা করিতেন এবং পাছে তাঁহার ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়, এই আশঙ্কায় অপরাপর পৌরজনের ন্যায় অধিক শারীরিক ব্যায়াম করিতেননা। জীবনধারণার্থ যে সকল স্বাভাবিক ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় অভাব, তাহাই তিনি মোচন করিতেন; ভোগাসক্তি ও ইন্দ্রিয়সেবা তিনি বিষবৎ পরিত্যাগ করিতেন। এইরূপে সক্রেটিস্‌ আপনার আকাঙ্ক্ষা ও অভাবসকল সংক্ষিপ্ত করিয়া স্বল্পেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারিয়াছিলেন। সাংসারিক কোন বিষয়ের নিমিত্ত তাঁহাকে পরের উপর নির্ভর করিতে হইতনা। এই নিমিত্ত তিনি প্রথমাবধি

আকাঙ্ক্ষা ও অভাবের অল্পতা—সন্তোষ, আত্মনির্ভর ও স্বাধীন প্রকৃতি

একটি উন্নত স্বাধীন ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে, অভাবহেতু তাঁহাকে কোন মিত্রের দ্বারস্থ হইতে হইবেনা; সুতরাং তিনি কাহারও অনুগ্রহের প্রার্থী ছিলেননা এবং কাহারও শত্রুতায় তাঁহার ভয় করিবার আবশ্যকতা ছিলনা। এইরূপে আপনাকে স্বাধীন অবস্থায় অবস্থিত করিয়া, তিনি অকুতোভয়চিত্তে স্বীয় জীবনের উদ্দেশ্যসাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সক্রেটিসের মিতাচার ও দরিদ্রতা তৎসদৃশ মনুষ্যের পক্ষে যে কতদূর ত্যাগস্বীকার, তাহা একবার অনুধাবন করিলে হৃদয় পুলকিত হয়।

যশঃ ও সম্পদ-লাভে নিঃস্পৃহতা—হীনবেশে মহাত্মগণের অবস্থিতি

তাঁহার যে প্রকার তীক্ষ্ণ ও প্রগাঢ় বুদ্ধি এবং মানসিক ক্ষমতা ছিল, তাহাতে তিনি অনায়াসে অত্যল্পকালমধ্যে একজন প্রধান ও প্রতাপান্বিত রাজকর্ম্মচারী হইয়া অতুল যশঃ ও ঐশ্বর্য্যের ভাগী হইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি আপনার লক্ষ্য অগ্রেই স্থির করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য তিনি অগ্রেই স্বীয় মানসপটে অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন;—তিনি সম্পদ চাহেননা, যশের আকাঙ্ক্ষা করেননা, তিনি দরিদ্র থাকিয়া জ্ঞান উপার্জ্জন করিবেন, সত্যের অন্বেষণ করিবেন। যাহারা ধনমদে মত্ত, তাহারা দরিদ্রতাকে ঘৃণা করে, কিন্তু তাহারা জানেনা যে, হীনবেশে কত মহদন্তঃকরণ অজ্ঞাতভাবে প্রচ্ছন্ন থাকে, এবং হীনবেশে কত মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীর অশেষ মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছেন।

( পরিবর্ত্তিত )



# সীতার মাতৃত্ব ও পাতিব্রত্য।

[কোশলাধিপতি রামচন্দ্র প্রজারঞ্জনানুরোধে অন্তঃসত্ত্বা সীতাদেবীকে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে নির্ব্বাসিত করেন। কিয়ৎকাল পরে সীতাদেবী সেই আশ্রমে দুই যমজ সন্তান প্রসব করেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই কুমারযুগলের বাল্যজীবন-বৃত্তান্ত, জানকীর অপত্যস্নেহ ও অপূর্ব্ব পাতিব্রত্যের কথা করুণ-কোমল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।]

জানকী দুই যমজ কুমার প্রসব করিলেন। মহর্ষি বাল্মীকি, যথাবিধানে জাতকর্ম্মাদি যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ করিয়া, জ্যেষ্ঠের নাম কুশ ও কনিষ্ঠের নাম লব রাখিলেন। মুনিতনয়ারা, সীতার সন্তান-প্রসবদর্শনে যার পর নাই হর্ষ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। সমস্ত আশ্রমে মহান্ আনন্দ-কোলাহল হইতে লাগিল। সীতা, দুঃসহ প্রসববেদনায় অভিভূত হইয়া, কিয়ৎক্ষণ অচেতনপ্রায় ছিলেন। তিনি অপেক্ষাকৃত স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিলে, মুনিতনয়ারা উল্লসিত মনে, প্রীতিপূর্ণ বচনে কহিলেন, "জানকি! আজি বড় আহ্লাদের দিন, সৌভাগ্যক্রমে তুমি পরম সুন্দর কুমারযুগল প্রসব করিয়াছ।" সীতা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র প্রফুল্ল ও আহ্লাদসাগরে মগ্না হইলেন; কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে, শোকভারে একান্ত অভিভূতা হইয়া, অবিরলধারায় অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মুনিকন্যারা সস্নেহসম্ভাষণসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অয়ি জানকি! এমন আনন্দের সময় এরূপ শোকাকুলা হইলে কেন?" বাষ্পভরে জানকীর কণ্ঠরোধ হইয়াছিল, এজন্য তিনি কিয়ৎক্ষণ কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিলেননা; অনন্তর উচ্ছলিত শোকাবেগ অপেক্ষাকৃত সংবরণ

সীতার সন্তান-প্রসব—আশ্রমবাসীর আনন্দ—সীতার হর্ষ ও বিষাদ

করিয়া কহিলেন, "অয়ি প্রিয় সখিগণ! তোমরা কি কিছুই জাননা যে, আমি এমন আনন্দের সময় কি জন্য শোকাকুলা হইলাম, জিজ্ঞাসা করিতেছ? পুত্র প্রসব করিলে স্ত্রীলোকের আহ্লাদের একশেষ হয়, যথার্থ বটে; কিন্তু কেমন অবস্থায় আমার সেই আহ্লাদের সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমার এ জন্মের মত সকল সুখ, সকল সাধ, সকল আহ্লাদ ফুরাইয়া গিয়াছে। যদি এই হতভাগ্যেরা আমার গর্ভে প্রবিষ্ট না হইত, তাহা হইলে যে মুহূর্ত্তে লক্ষ্মণ পরিত্যাগবাক্য শ্রবণ করাইলেন, সেই মুহূর্ত্তেই জাহ্নবী-জলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতাম, অথবা অন্য কোন প্রকারে আত্মঘাতিনী হইতাম। আমার কি আবার প্রাণ রাখিতে হয়, না লোকালয়ে মুখ দেখাইতে হয়?"

এই বলিয়া, একান্ত শোকভারাক্রান্ত হইয়া, সীতা অনিবার্য্য বেগে বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মুনিকন্যারা, সীতার এইরূপ হৃদয়বিদারক বিলাপবাক্যশ্রবণে, সাতিশয় দুঃখিতা হইলেন এবং প্রণয়পূর্ণ বচনে কহিতে লাগিলেন, "প্রিয় সখি! শোকাবেগ সংবরণ কর; যাহা কহিতেছ, যথার্থ বটে; কিন্তু অধিক দিন তোমায় এ অবস্থায় কালযাপন করিতে হইবেনা। রাজা রামচন্দ্রের বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল, তাহাতেই তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, এরূপ অদৃষ্টচর, অভূতপূর্ব্ব, নৃশংস আচরণ করিয়াছেন। আমরা পিতার প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি, তুমি অচিরে পরিগৃহীতা হইবে; অতএব শোক সংবরণ কর।" মুনিতনয়াদিগের সান্ত্বনাবাদ শ্রবণ করিয়া, সীতার নয়নযুগল হইতে প্রবলবেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে মুনিকন্যাদিগের কোমল হৃদয় দ্রবীভূত হইল; তখন তাঁহারাও শোকাভিভূতা হইয়া, প্রভূত বাষ্পবারি বিমোচন করিতে লাগিলেন।

মুনিকন্যাগণের সহানুভূতি ও সান্ত্বনা

এই সময়ে সদ্যঃপ্রসূত বালকেরা রোদন করিয়া উঠিল। স্নেহের এমনই মহিমা ও মোহিনী শক্তি যে, তাহাদের ক্রন্দনশব্দ জানকীর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, তিনি এককালে সকল শোক বিস্মৃত হইলেন, এবং সত্বর সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত স্নেহভরে তাহাদিগকে স্তন্যপান করাইতে লাগিলেন।

স্নেহের শক্তি

কুমারেরা শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায়, দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, জননীর নয়নের ও মনের অনির্ব্বচনীয় আনন্দ সম্পাদন করিতে লাগিল। যখন তাহারা তাঁহাকে আধ আধ কথায় মা মা বলিয়া আহ্বান করিত, যখন তিনি তাহাদের সন্নিবেশিত মুক্তাকলাপসদৃশ দন্তগুলি অবলোকন করিতেন, যখন তাহাদের অর্দ্ধোচ্চারিত মৃদু মধুর বচন-পরম্পরা তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিত, যখন তিনি তাহাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া স্নেহভরে তাহাদের মুখচুম্বন করিতেন, তখন তিনি সকল শোক বিস্মৃত হইতেন; তাঁহার সর্ব্বশরীর অমৃতাভিষিক্তের ন্যায় শীতল ও নয়নযুগল আনন্দাশ্রুজলে পরিপ্লুত হইত।

সন্তান-বৎসলা জননীর আনন্দ—শোক-বিস্মৃতি

ক্রমে ক্রমে কুশ ও লব পঞ্চমবর্ষীয় হইলে, মহর্ষি বাল্মীকি তাহাদের চূড়াকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া বিদ্যারম্ভ করাইলেন। বালকেরা অসাধারণ বুদ্ধি, মেধা ও প্রতিভা-প্রভাবে অল্পকালমধ্যেই বিবিধ বিদ্যায় বিলক্ষণ কৃতকার্য্য হইয়া উঠিল। ইতঃপূর্ব্বে বাল্মীকি, রাবণবধান্ত লোকোত্তর রামচরিত অবলম্বন করিয়া রামায়ণ নামে বহুবিস্তৃত মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রথমে, তিনি সেই অমৃতরসবর্ষী অপূর্ব্ব মহাকাব্য রামচন্দ্রের পুত্রদিগকে অধ্যয়ন করাইলেন। তাহারা অল্প দিবসেই সেই বিচিত্র গ্রন্থ আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ

কুশীলবের শিক্ষা



ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

করিল, এবং মাতৃসমক্ষে মধুরস্বরে আবৃত্তি করিয়া তদীয় শোকনিবৃত্তি করিতে লাগিল। একাদশবর্ষে, মহর্ষি তাহাদের উপনয়ন-সংস্কার সম্পাদন করিয়া, বেদ অধ্যয়ন করাইতে আরম্ভ করিলেন। বালকেরা সংবৎসর-কালেই সমগ্র বেদশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করিল।

জানকীর সন্তানপালন—তপস্যা—অপূর্ব্ব পাতিব্রত্য—পতি-বিরহে দৈহিক অবস্থা।

জননীর অনির্ব্বচনীয় স্নেহসহকৃত-প্রযত্ন-ব্যতিরেকে যতদিন পর্য্যন্ত সন্তানের জীবনরক্ষা সম্ভাবিত নয়, ততদিন জানকী সর্ব্বশোকবিস্মরণ-পূর্ব্বক অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া কুশ ও লবের লালনপালনে ব্যাপৃতা ছিলেন। তাহাদের শৈশবকাল কিঞ্চিৎ অতিক্রান্ত হইলে, মাতৃযত্নের তাদৃশী অপেক্ষা রহিলনা। তখন তিনি তাহাদের বিষয়ে এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইয়া ঋষিপত্নীদিগের ন্যায় তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। রামচন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল-প্রার্থনাই তদীয় তপস্যার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। যদিও রাম নিতান্ত নিরপরাধে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি একদিন একক্ষণের জন্যও সীতার অন্তঃকরণে তাঁহার প্রতি রোষ বা বিরাগের উদয় হয় নাই। তিনি যে দুস্তর শোক-সাগরে পরিক্ষিপ্তা হইয়াছিলেন, তাহা কেবল তাঁহার নিজের ভাগ্যদোষেই ঘটিয়াছে, এই বিবেচনা করিতেন; ভ্রমক্রমেও ভাবিতেননা যে, তদ্বিষয়ে রামচন্দ্রের কোন অংশে কিছুমাত্র দোষ আছে। বস্তুতঃ, রামচন্দ্রের প্রতি তাঁহার যেরূপ অবিচলিত ভক্তি ও ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তিনি দেবতাদিগের নিকট কায়মনোবাক্যে নিয়ত এই প্রার্থনা করিতেন, যেন রামচন্দ্র কুশলে থাকেন, এবং জন্মান্তরে তিনি যেন রামচন্দ্রকেই পতি লাভ করেন। দিবাভাগে তপস্যাদি কার্য্যে ব্যাপৃতা ও সখিভাবাপন্ন ঋষিকন্যাগণে পরিবৃতা থাকিয়া তিনি কথঞ্চিৎ কালযাপন করিতেন; কিন্তু যামিনীযোগে

একাকিনী হইলেই তাঁহার দুর্নিবার শোক-সিন্ধু উথলিয়া উঠিত। তিনি কেবল রামচন্দ্র-চিন্তায় মগ্না থাকিয়া, ও অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করিয়া, রজনী-যাপন করিতেন। সীতা যেরূপ পতিপ্রাণা ছিলেন, তাহাতে অকাতরে পতি-বিরহ-যাতনা সহ্য করিতে পারিবেন, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। কালসহকারে সকলেরই শোক শিথিল হইয়া যায়, কিন্তু জানকীর শোক সর্ব্বদাই নবীভূত ছিল। এইরূপে ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর দুর্ব্বিষহ শোক-দহনে নিরন্তর অন্তর্দ্দাহ হওয়াতে, জানকীর অলৌকিক রূপলাবণ্য অন্তর্হিত এবং কলেবর চর্ম্মাবৃত কঙ্কালমাত্রে পর্য্যবসিত হইল।



# আলস্য।

নদীর স্রোত রুদ্ধ হইলে যেমন তাহার জল ক্রমশঃ বিকৃত হইয়া উঠে, সেইরূপ আমাদিগের শরীরচারী শোণিতের গমনাগমনপথ রুদ্ধ হইলে উহার বিকার উপস্থিত হয়। নদীর স্রোত যত বহিতে থাকে, ততই তাহার জল নির্ম্মল হয়। আমাদিগের শরীরচারী শোণিতও যত সঞ্চালিত হয়, ততই পরিষ্কার থাকে। কায়িক ব্যাপার ব্যতিরেকে রক্তের গমনাগমনপথ পরিশুদ্ধ থাকেনা। আলস্যদোষে ক্রমশঃ আমাদিগের শরীরচারী শোণিতের গমনাগমনপথ রুদ্ধ হইয়া যায়; রক্ত-সঞ্চরণ রুদ্ধ হইলে পীড়া জন্মে।

আলস্যের ফলে রক্ত-সঞ্চালন-রোধ ও পীড়ার উৎপত্তি

আমাদিগের শরীরে যত পীড়া জন্মিয়া থাকে, বোধ হয়, আলস্য তৎসমুদয়ের প্রধান কারণ। যিনি নিয়মিতরূপে ব্যায়ামাদিক্রিয়া নির্ব্বাহ করেন, তাঁহাকে অলস ব্যক্তির ন্যায় চিররুগ্ন হইয়া শয্যাতলে বিলুণ্ঠিত হইতে হয়না। কত লোক কেবল ব্যায়াম-গুণে নানাপ্রকার রোগ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন।

আলস্যের রোগজননপ্রবণতা—ব্যায়ামে রোগমুক্তি

মানুষ আলস্য-দোষে দূষিত হইলে কেবল যে নানাবিধ রোগে রুগ্ন হয়, এমন নহে, তাহাকে বিবিধরূপে কষ্ট-ভাগী হইতে হয়। দরিদ্র ব্যক্তি অলস হইলে, তাহার পরিবারগণের ভরণপোষণ দূরে থাকুক, তাহার আত্মোদর পরিপূর্ণ করাই ভার হইয়া উঠে; ভাগ্যবান্ ব্যক্তি শ্রম-বিমুখ হইলে, তাহার ঐশ্বর্য্য ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

আলস্য—রোগ ও ক্লেশের কারণ

আলস্য মহত্ত্বলাভের প্রধান প্রতিবন্ধক। যাহারা শৈশবাবধি আলস্যে কালক্ষেপ করে, তাহারা জ্ঞানোপার্জ্জনে সমর্থ হয়না। জ্ঞানহীন মনুষ্য পশুর সমান। জ্ঞানালোক ব্যতীত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবোধ এবং অন্তঃকরণের ভ্রম-প্রমাদ দূরীকৃত হয়না। যাহার অন্তঃকরণ ভ্রম-প্রমাদে পরিপূর্ণ, তাহার সাংসারিক সুখ-সম্ভোগের সম্ভাবনা নাই, তাহার মনুষ্যত্বলাভই বৃথা।

আলস্য—জ্ঞান, মহত্ত্ব ও সুখলাভের অন্তরায়

আলস্য মানুষের কুকর্ম্মে প্রবৃত্তির প্রধান কারণ। মানুষ যখন অলস হইয়া বসিয়া থাকে, তখন তাহার মন বিপথে ধাবমান হয়। মন অতি চঞ্চল; বিষয়াসক্তিশূন্য হইয়া কখনও নিশ্চিন্ত থাকেনা;—তাহাকে সদ্বিষয়ে বিনিয়োজিত রাখিতে না পারিলেই সে বিপথগামী হয়। এই নিমিত্তই অলস লোকদিগকে কুকর্ম্মে রত দেখিতে পাওয়া যায়।

কুকর্ম্মে প্রবৃত্তি

অনেকে মনে করে যে সকল ব্যক্তি অলস হইয়া বসিয়া থাকে, তাহারাই সুখী;—কিন্তু সে ভ্রান্তি মাত্র। নিরবচ্ছিন্ন নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিলে কেহ কখনও সুখী হয়না। নিরন্তর আলস্যে কালক্ষেপ করিলে চিত্ত স্ফূর্ত্তি-বিরহিত হয়; মনে স্ফূর্ত্তি না থাকিলে শরীর কখনও স্বচ্ছন্দে থাকেনা। শরীর ও মন উভয়ের মধ্যে এরূপ নিকট সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট আছে যে, একের সুখ বা অসুখে অন্যকে সুখী বা অসুখী হইতে হয়।

আলস্য সুখের অন্তরায়—শরীর ও মনের সম্বন্ধ

অলস লোকদিগের কোন কর্ম্ম নাই, কিন্তু নিয়মিত কালে আহার নিদ্রার অবকাশও নাই। অলসেরা যেরূপে কালহরণ করে, তাহা অনুভব করিয়া দেখিলে চমৎকার বোধ হয়। আহার, নিদ্রা, গল্প, কলহ, ক্রীড়া ও কুকর্ম্ম—ইহাতেই তাহাদিগের সময় অতিবাহিত হইয়া থাকে।

অলসের অনুচিত কর্ম্মে কালক্ষেপ

# তপোবন।

[ বিন্ধ্যাচলের সন্নিহিত অগস্ত্যাশ্রমের অদূরবর্ত্তী পম্পা-সরোবর-কূলে এক বিশাল-শাল্মলী-তরুকোটরে এক মাতৃহীন শুকশিশু বৃদ্ধ পিতার স্নেহশীতল পক্ষপুটের আশ্রয়ে বাস করিত। একদা বৃদ্ধ শুক ব্যাধহস্তে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে, শুকশিশু আশ্রয়চ্যুত হইয়া ভূপতিত হইল। মহর্ষি-জাবালিনন্দন হারীত পথিপার্শ্বে কুলায়ভ্রষ্ট শুকশিশু-দর্শনে করুণার্দ্র হইয়া তাহাকে আশ্রমে লইয়া গেলে, ত্রিকালদর্শী মহর্ষি তাহার পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণন করেন। মহর্ষিবর্ণিত বৃত্তান্ত শ্রবণে শুকশিশুর জন্মান্তরীণ স্মৃতি উদ্বোধিত হয় এবং পক্ষিশাবক তন্মুহূর্ত্তেই মনুষ্যের ন্যায় বাক্যোচ্চারণ-শক্তি লাভ করে। অতঃপর মুনিকুমার হারীতের যত্ন ও স্নেহে শুকশিশু বর্দ্ধিতকায় ও উদ্ভিন্নপক্ষ হইলে ইহার হৃদয়ে জন্মান্তরীণ সুহৃদ্‌বর্গের সংসর্গ লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা সঞ্জাত হয় এবং একদা এই দুর্দ্দমনীয় বাসনার পরিতৃপ্তির জন্য স্নেহপালিত শুকশাবক আশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক জন্মান্তরীণ সুহৃদের অন্বেষণে বহির্গত হয়। কিন্তু পথিমধ্যে এক ব্যাধের জালবন্ধনে বদ্ধ হইয়া প্রথমতঃ চণ্ডালরাজপুরে ও তৎপর বিদিশাধিপতি শূদ্রকের রাজসভায় নীত হয়। রাজা শূদ্রকের নিকটে এই পক্ষীর আত্মবৃত্তান্তবর্ণন-প্রসঙ্গে মহর্ষি জাবালির তপোবনের কথা বর্ণিত হইয়াছে।]

তপোবনের দৃশ্য

তপোবন সন্নিহিত হইলে দেখিলাম, তত্রস্থ তরু ও লতাসকল কুসুমিত, পল্লবিত ও ফলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে। এলা ও লবঙ্গলতার কুসুম-গন্ধে দিক্ আমোদিত হইতেছে। মধুকর ঝঙ্কার করিয়া এক পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে বসিয়া মধুপান করিতেছে। অশোক, চম্পক, কিংশুক, সহকার, মল্লিকা, মালতীপ্রভৃতি নানাবিধ বৃক্ষ ও লতার সমাবেশে এবং তাহাদিগের শাখা ও পল্লবের পরস্পরসংযোগে মধ্যে মধ্যে রমণীয় গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। উহার অভ্যন্তরে দিনকরের কিরণ প্রবেশ করিতে পারেনা। মহর্ষিগণ মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক প্রজ্বলিত অনলে ঘৃতাহুতি প্রদান

করিতেছেন এবং প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার উত্তাপে বৃক্ষের পল্লবসকল মলিন হইয়া যাইতেছে। গন্ধবহ হোমগন্ধ বিস্তারপূর্ব্বক মন্দ মন্দ বহিতেছে। মুনিকুমারেরা কেহ বা উচ্চৈঃস্বরে বেদ উচ্চারণ, কেহ বা প্রশান্তভাবে ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিতেছেন। মৃগকদম্ব নির্ভয়চিত্তে বনের চতুর্দ্দিকে খেলিয়া বেড়াইতেছে। শুকমুখভ্রষ্ট নীবারকণিকা তরুতলে পতিত রহিয়াছে।

তপোবন দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ আহ্লাদে পুলকিত হইল। অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, রক্তপল্লবশোভিত রক্তাশোকতরুর ছায়ায় পরিষ্কৃত পবিত্র স্থানে বেত্রাসনে ভগবান্ মহাতপা মহর্ষি জাবালি বসিয়া আছেন। অন্যান্য মুনিগণ চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট রহিয়াছেন। মহর্ষি অতি প্রাচীন, জরার প্রভাবে মস্তকের জটাভার ও গাত্রের লোমসকল ধবলবর্ণ, কপালে ত্রিবলী, গণ্ডস্থল নিম্ন, শিরা ও পঞ্জরের অস্থিসকল বহির্গত এবং শ্বেতবর্ণ লোমে কর্ণ-বিবর আচ্ছাদিত। তাঁহার প্রশান্ত ও গম্ভীর আকৃতি দেখিবামাত্র বোধ হয় যেন, তিনি করুণারসের প্রবাহ, ক্ষমা ও সন্তোষের আধার, শান্তিলতার মূল, ক্রোধ-ভুজঙ্গের মহামন্ত্র, সৎপথের দর্শক ও সৎস্বভাবের আশ্রয়। তাঁহাকে দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল। ভাবিলাম, মহর্ষির কি প্রভাব! ইঁহার প্রভাবে তপোবনে হিংসা, দ্বেষ, বৈর, মাৎসর্য্য, কিছুই নাই। ভুজঙ্গেরা আতপতাপিত হইয়া শিখীর শিখা-কলাপের ছায়ায় সুখে শয়ন করিয়া আছে। হরিণশাবকেরা সিংহশাবকের সহিত সিংহীর স্তন্যপান করিতেছে। করভসকল ক্রীড়া করিতে করিতে শুণ্ড দ্বারা সিংহকে আকর্ষণ করিতেছে। মৃগকুল অব্যাকুলচিত্তে বৃকের সহিত একত্র

মহর্ষি জাবালির আকৃতি ও প্রকৃতি—মহর্ষির প্রভাবে তপোবনে হিংসালেশ-শূন্যতা

চরিতেছে এবং শুষ্ক বৃক্ষও মুকুলিত হইতেছে। বোধ হয় যেন, সত্যযুগ কলিকালের ভয়ে পলাইয়া তপোবনে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছে। অনন্তর ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম, আশ্রমস্থিত তরুগণের শাখায় মুনিগণের বল্কল শুকাইতেছে, কমণ্ডলু ও জপমালা ঝুলিতেছে এবং মূলদেশে বসিবার নিমিত্ত বেদী নির্ম্মিত হইয়াছে। বোধ হয় যেন, বৃক্ষসকলও তপস্বিবেশ ধারণপূর্ব্বক তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ক্রমে দিবাবসান হইল। মুনিজনেরা রক্তচন্দন-সহিত যে অর্ঘ্যদান করিয়াছিলেন, সেই রক্তচন্দনে অনুলিপ্ত হইয়াই যেন রবি রক্তবর্ণ হইলেন।

সূর্য্যাস্ত—সন্ধ্যায় তপোবনের দৃশ্য—নিশা-সমাগম

রবির কিরণ ধরাতল পরিত্যাগ করিয়া কমলবনে, কমলবন ত্যাগ করিয়া তরুশিখরে এবং তদনন্তর পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিল; বোধ হইল যেন পর্ব্বতশিখর সুবর্ণে মণ্ডিত হইয়াছে। রবি অস্তগত হইলে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। সন্ধ্যা-সমীরণে তরুশাখাসকল সঞ্চালিত হইলে বোধ হইল যেন, তরুগণ বিহঙ্গদিগকে নিজ নিজ কুলায়ে আগমন করিবার নিমিত্ত অঙ্গুলি-সঙ্কেতদ্বারা আহ্বান করিল। বিহগ-কুলও কলরব করিয়া যেন তাহার উত্তর প্রদান করিল। মুনিজনেরা ধ্যানে বসিলেন ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সন্ধ্যার উপাসনা করিতে লাগিলেন। দুহ্যমান্ হোমধেনুর মনোহর দুগ্ধধারাধ্বনি আশ্রমের চতুর্দ্দিক্ ব্যাপ্ত করিল। হরিদ্বর্ণ কুশদ্বারা অগ্নিহোত্রবেদী আচ্ছাদিত হইল। দিনের বেলায় দিনকরের ভয়ে গিরিগুহার অভ্যন্তরে লুকাইয়াছিল, এই সময় সময় পাইয়া অন্ধকার তথা হইতে বহির্গত হইল। সন্ধ্যা ক্ষয়প্রাপ্তা হইলে তাহার শোকে দুঃখিতা ও তিমিররূপ মলিন বসনে অবগুণ্ঠিতা হইয়া বিভাবরী আগমন করিল। ভাস্করের প্রতাপে গ্রহগণ তস্করের ন্যায় ভয়ে লুকাইয়াছিল, অন্ধকার পাইয়া অমনি গগনমার্গে বহির্গত হইল। পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে

সুধাংশুর অংশু অল্প অল্প দৃষ্টিগোচর হওয়াতে বোধ হইল যেন, প্রিয়-সমাগমে আহ্লাদিত হইয়া পূর্ব্বদিক্ দশন-বিকাশপূর্ব্বক মন্দ মন্দ হাসিতেছে। প্রথমে কলা মাত্র, ক্রমে অর্দ্ধ মাত্র, ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণমণ্ডল শশধর প্রকাশিত হওয়াতে সমুদয় তিমির বিনষ্ট হইয়া গেল। কুমুদিনী বিকসিত হইল। মন্দ মন্দ সন্ধ্যাসমীরণ সুখাসীন আশ্রমমৃগগণকে আহ্লাদিত করিল। জীবলোক আনন্দময়, কুমুদ গন্ধময় ও তপোবন জ্যোৎস্নাময় হইল।

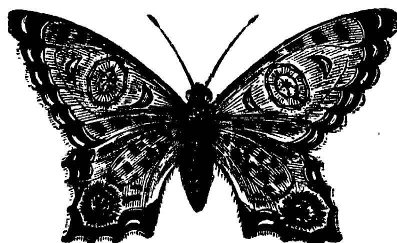


# প্রাচীন মিসর।

মিসর দেশের কি অনুপম শোভা! দর্শনমাত্র বোধ হয়, যেন, কমলা সর্ব্বকাল এই দেশে বিরাজমানা আছেন। এই দেশে দ্বাবিংশতি সহস্র নগর; ঐ সকল নগরের শাসন-প্রণালী কি সুন্দর! তথায় ধনবান্ দরিদ্রের উপর ও বলবান্ দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিতে পারেনা। বালকদিগের বিদ্যাভ্যাসের রীতি কি উত্তম! তাহারা বশ্যতা, পরিশ্রম, সদাচার ও বিদ্যানুরাগ নিত্য অভ্যাস করিয়া থাকে। পিতামাতারা ধর্ম্মনিষ্ঠা, নিঃস্বার্থ লোকহিতৈষিতা, সম্মানাকাঙ্ক্ষা, অকপট ব্যবহার ও দেবভক্তি, এই সমস্ত গুণের বীজ শৈশবকালাবধি স্বীয় স্বীয় সন্তানদিগের অন্তঃকরণে রোপণ করিতে আরম্ভ করেন। এই মঙ্গলকর নিয়মাবলী অনুধ্যান করিলে অন্তঃকরণ আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। যে রাজা এইরূপ সুনিয়মে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করেন, তাঁহার প্রজারাই যথার্থ সুখী; কিন্তু যে ধর্ম্মপরায়ণ রাজার দয়া-দাক্ষিণ্যগুণে অসংখ্য লোকের সুখ সংবর্দ্ধিত হয় এবং ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির প্রবলতানিবন্ধন যাঁহার হৃদয়কন্দর নিরন্তর অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে উচ্ছলিত থাকে, তিনি তাহাদিগের অপেক্ষা অধিক সুখী; প্রজারা তাঁহার রমণীয় গুণগ্রামে মুগ্ধ ও প্রীত হইয়া বশীভূত থাকে এবং তদীয় আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করে। তিনি প্রজাগণের হৃদয়-রাজ্যে আধিপত্য করেন। প্রজারা তাঁহাকে এরূপ

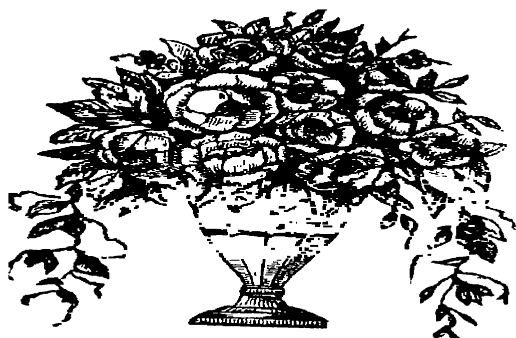
প্রাচীন মিসরের দৃশ্য—মিসর-বাসীর প্রকৃতি ও নীতি-পরায়ণতা—রাজা ও প্রজা

স্নেহ ও ভক্তি করে যে, তাহাদিগের তদীয় রাজ্যতক্তের অভিলাষ করা দূরে থাকুক, তাহারা তাঁহার মর্ত্ত্যতা চিন্তা করিয়া সাতিশয় কাতর হয় এবং যদি আপন আপন জীবন দিলে ও রাজা চিরজীবি হইতে পারেন, তাহাতেও পরাঙ্মুখ হয়না।





# দ্বিতীয় স্তবক।



# প্রবন্ধ-পরিচয়।

## রোগীর সেবা—ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

এই সন্দর্ভ 'পারিবারিক প্রবন্ধ' নামক অপূর্ব্ব নীতিগ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত। ইহার সর্ব্বত্র লেখকের মৌলিকতা, চিন্তাশীলতা ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। রোগীর প্রতি পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের ও শুশ্রূষাকারীর কর্ত্তব্য কি, তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধে বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে। ভাষার প্রাঞ্জলতা ও বর্ণনা-নৈপুণ্যে এবং স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান-সম্মত বিবিধ সারগর্ভ উপদেশের সমাবেশে প্রবন্ধটি সাতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

## সেকাল ও একাল—রাজনারায়ণ বসু।

এই প্রবন্ধ 'সেকাল ও একাল' নামক সুপ্রসিদ্ধ সমাজ-চিত্র হইতে গৃহীত। 'সেকাল ও একাল' শীর্ষক প্রবন্ধ National Society নামক সমিতির এক অধিবেশনে পঠিত হয় এবং পরে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। তৎকালে এই গ্রন্থ সর্ব্বত্র এরূপ প্রশংসিত হয় যে, তদানীন্তন বড় লাট লর্ড নর্থব্রুক মহোদয় ইহার প্রশংসাবাদ শ্রবণে ২০০১ টাকা ব্যয়ে ইহার ইংরাজী অনুবাদ করাইয়া পাঠ করেন। এই গ্রন্থে উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা-প্রচলনের পূর্ব্বে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালী সমাজের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার একটি অবিকল চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেকালের সদাশয় ইংরাজ মহাপুরুষ-দিগের মহত্ত্ব ও সহৃদয়তা, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সরলতা, সন্তোষ ও নির্লোভিতা, রাজকর্ম্মচারী-দিগের অর্থোপার্জ্জন এবং ধনিগণের বদান্যতা ও সৎকার্য্যের বিবরণ সাতিশয় নৈপুণ্য সহকারে বর্ণিত হইয়াছে। প্রতিভাশালী লেখকের আন্তরিকতা, সমাজতত্ত্বাভিজ্ঞতা ও মানবচরিত্রজ্ঞানের সহিত ভাষার প্রাঞ্জলতা ও সরসতার সম্মিলনে প্রবন্ধটি সাতিশয় চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

## দীপনির্ব্বাণ—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

'বিষবৃক্ষ' নামক সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদের শেষাংশ ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ এই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত হইয়াছে। 'বিষবৃক্ষ' বঙ্কিমচন্দ্রের চতুর্থ উপন্যাসগ্রন্থ। ১২৭৯ সালের বৈশাখমাস হইতে ইহা ধারাবাহিকভাবে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয় এবং ১৮৮৩ সালের ১লা জুন গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। মিসেস নাইট্ 'Poison Tree' নামে এই গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে মেঘাচ্ছন্ন আকাশতলে বর্ষণ-বিধৌত প্রদোষ-প্রকৃতির দৃশ্য, বিগত-বিভব মুমূর্ষু গৃহস্থের ভগ্নগৃহ ও অন্তিমজীবনের এবং তাহার সর্ব্বসহায়বঞ্চিতা তরুণী দুহিতার করুণ, মর্ম্মন্তুদ আলেখ্য শব্দশিল্পনিপুণ লেখকের অপূর্ব্ব বর্ণনকুশলতায় সাতিশয় হৃদয়স্পর্শী হইয়াছে।

# প্রবন্ধ-পরিচয়।

## চিত্রাবলী—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

এই প্রবন্ধ 'বিষবৃক্ষের' চতুশ্চত্বারিংশতম পরিচ্ছেদ হইতে গৃহীত। ইহাতে গোবিন্দপুর নিবাসী নগেন্দ্রনাথ দত্তের পত্নী সূর্য্যমুখীর শয্যাগৃহে রক্ষিত চিত্রাবলীর বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই সকল চিত্রের পরিকল্পনার বর্ণনা, লেখকের অপূর্ব্ব চিত্রাঙ্কন-প্রতিভা-প্রভাবে ও বিচিত্র কলা-নৈপুণ্যের সমাবেশে সরস ও চিত্তহারী হইয়াছে।

## ব্যোমযান ও ব্যোমবিহার—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

এই প্রবন্ধ 'বিজ্ঞানরহস্য' নামক গ্রন্থের 'গগন-পর্য্যটন' শীর্ষক সন্দর্ভ হইতে সঙ্কলিত। ইহাতে ব্যোমবিহারকালে প্রত্যক্ষীভূত আকাশ ও ধরণীর বিচিত্র দৃশ্যাবলীর বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। অপূর্ব্ব প্রতিভাশালী লেখকের অসাধারণ বর্ণনা-বৈচিত্র্যে এবং লীলাময়ী ভাষার স্বচ্ছন্দ প্রয়োগ-কুশলতায় এই বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ কোমল কাব্য-চিত্রের ন্যায় চিত্তাকর্ষক ও সুখপাঠ্য হইয়াছে।

## আমোদ ও হাস্য—প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

এই প্রবন্ধে নির্দ্দোষ আমোদ ও হাস্যের প্রয়োজনীয়তা সরল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।




রোগীর সেবা পরিবারবর্গের যে কতদূর করা উচিত, আমি তাহার ইয়ত্তা করিতে পারি নাই। এই বিষয়ে আমাদিগের সম্মিলিত পরিবারের গুণবত্তা অপরিসীম বলিয়াই বোধ হয়। এই সময়ে মিলিত পরিবারের অর্থ এবং মন এক হইয়া যায়।

*রোগীর সেবায় সম্মিলিত পরিবারের গুণবত্তা*

যদি রোগীর সেবার কোন সীমা থাকে, তবে সে সীমা বাহির হইতে নির্দ্দিষ্ট হইবার নয়। সে সীমা, সেবার উদ্দেশ্য কি, ইহাই বিচার করিয়া পাওয়া যাইতে পারে। সেবার উদ্দেশ্য পীড়িতকে রোগমুক্ত করা। রোগীর মনে ভয়সঞ্চার হইলে রোগমুক্তির চেষ্টা বিফল হইতে পারে, এইজন্য এমনভাবে সেবা করা আবশ্যক, যাহাতে রোগী মনে না করিতে পারে, তাহার জন্য পরিবার অতি ভীত হইয়া পড়িয়াছে। তুমি স্ত্রী, কি পুত্র, কি ভ্রাতা, রোগীর সেবায় নিযুক্ত হইয়াছ—তোমার আহার করিবার সময় হইল, আর যে ব্যক্তি তোমার স্থান গ্রহণ করিবে, সে রোগীর ঘরে আসিল, তোমাকে খাইতে যাইবার অবসর দিল, তুমি যাইতে চাহনা। ইহাতে রোগী কি ভাবিবে? তুমি তাহার পীড়ার আতিশয্যে ভীত হইয়াছ, ইহাই বুঝিবেনা কি? এবং তাহা বুঝিলে স্বয়ং ভীত হইবেনা কি? অতএব ওরূপ করিওনা।

*রোগিসেবার উদ্দেশ্য—রোগি-হৃদয়ে ভয়-সঞ্চারের কারণ পরিহার ও ধৈর্য্যাবলম্বন—স্নেহাতিশয্যের দোষ*

ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া আহার করিতে যাও। আর তুমি মা, শিশু পীড়িত হইয়া তোমার ক্রোড়ে শায়িত—তুমি রাত্রিদিন তাহার মলিন মুখমণ্ডলের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছ। খাইতে যাওনা, শুইতে যাওনা, একেবারে শরীর-পাত করিতেছ। তোমার শোকবিহ্বল-হৃদয়-শোণিত দূষিত হইতেছে,তোমার দুগ্ধ,—যাহা উহার সর্ব্বাপেক্ষা সুপথ্য,তাহা বিষবৎ হইয়া উঠিতেছে, তুমি অধীরা হইয়া শিশুর ত কোন উপকারই করিতে পারিতেছ না, উহাকে দূষিতস্তন্যরূপ বিষপান করাইয়া তাহার সাক্ষাৎবধভাগিনী হইতেছ। মনে কর, উটি যেন শিশু নয়, তোমার ক্রন্দনের, হা হুতাশের, উপবাসের ও অনিদ্রার প্রকৃত হেতুই বুঝিতে সমর্থ—তাহা হইলে ত, ও বড়ই ভীত হইবে। কিন্তু যাহাতে রোগী ভীত হইতে পারে, এমন কাজ করিতে নাই। অতএব ধৈর্য্যাবলম্বন কর, আপনার শরীরকে সুস্থ রাখ, শিশুর সর্ব্বোৎকৃষ্ট পথ্যটি নষ্ট করিওনা। এইজন্যই প্রাচীনা গৃহিণীরা বলিতেন,—“পীড়িত ছেলেকে কোলে করিয়া চক্ষের জল ফেলিতে নাই।”

তবে কি রোগীর নিকটে হাস্য, কৌতুক, বিদ্রূপাদি করিয়া দেখাইব যে, আমি তাহার পীড়ায় কিছুমাত্র ভীত হই নাই? বরং এ পক্ষ অবলম্বন করা ভাল, তথাপি অধীর এবং ভয়-বিহ্বল হওয়া ভাল নয়। কিন্তু এরূপ কৃত্রিম ব্যবহারেরও অনেক দোষ আছে। যাহা কৃত্রিম এবং মিথ্যা, তাহার সমগ্র ফল কখনই উত্তম হইতে পারেনা। রোগী ঐ কৃত্রিমতা বুঝিতে পারিয়া বিরক্ত হইবে,—অথবা যদি বুঝিতে না পারে, তোমাকে নির্ম্মম এবং হৃদয়শূন্য মনে করিবে, অথবা স্বয়ং হাস্য-পরিহাসে যোগ দিতে গিয়া নিজের নাড়ী চঞ্চল এবং স্নায়ুমণ্ডল বিলোড়িত করিয়া তুলিবে। অতএব ওরূপ কৃত্রিমতাও দূষ্য।

কৃত্রিম ব্যবহারের কুফল

রোগীর সেবক সর্ব্বদা রোগীর প্রতি তন্মনস্ক হইয়া থাকিবেন, তাহার কি কষ্ট হইতেছে, তাহা বিনা কথনে এবং বিনা ইঙ্গিতে বুঝিবেন এবং সেই কষ্ট নিবারণ বা উপশমের যে উপায় আছে, তাহা তৎক্ষণাৎ প্রয়োগ করিবেন। কোন ব্যস্ততার লক্ষণ দেখাইবেননা; স্বয়ং ধীর ও শান্তমূর্ত্তি হইয়া পীড়িত-রূপ দেবতার পূজা করিতে থাকিবেন।

শুশ্রূষাকারীর একাগ্রতা, ক্ষিপ্রতা ও ধৈর্য্য

পীড়িতের সেবকে আর দেবতার সেবকে অনেকটা সাদৃশ্য আছে। সাধককে স্থিরাসন হইয়া থাকিতে হয়। চঞ্চল লোকেরা,—যাহারা সর্ব্বদা এপাশ ওপাশ হইয়া বসিতে থাকে, একভাবে স্থির থাকিতে পারেনা,—তাহারা ভাল সেবক হয়না। সাধককে নিশ্চল-দৃষ্টি হইতে হয়। তাহার হৃদয়ে ধ্যানগম্য ইষ্টমূর্ত্তি সর্ব্বক্ষণ জাগরূক থাকে। সেবককেও পীড়িতের পূর্ব্বমূর্ত্তি এবং পূর্ব্বভাব দৃঢ়রূপে স্মরণ রাখিতে হয়। তাহা হইলেই ব্যাধিজনিত লক্ষণ-বিপর্য্যয় তাঁহার লক্ষ্যমধ্যে আইসে। সাধকের পক্ষে তন্মনস্ক হওয়া অত্যাবশ্যক। সেবককে ও পীড়িতের প্রতি তন্মনস্ক হইয়া থাকিতে হয়। তাহা না হইলে, তিনি উহার কোন্ সময়ে কি প্রয়োজন হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারেননা। রোগীকে কথা কহিয়া অথবা ইঙ্গিত করিয়া আত্মপ্রয়োজন ব্যক্ত করিতে হয়। রুগ্ন ব্যক্তিরা তাহা করিতে পারেনা এবং চাহেওনা, সুতরাং বড়ই বিরক্ত এবং দুঃখিত হয়। যে সেবক বা সেবিকাতে সাধকের পূর্ব্বোক্ত গুণসমূহ বিদ্যমান, তিনি রোগীর ঘরে প্রবেশ করিলেই রোগীর প্রফুল্লতা জন্মে। তিনি আসিয়াই যেন জানিতে পারেন—একটু জল চাই—কি দুই চারিটা দাড়িম্বের দানা চাই,—গায়ের কাপড়টা একটু পায়ের দিকে টানিয়া দিতে হইবে,—বালিশটা একটু উচ্চ করিয়া দিতে হইবে,—শীতল হস্তটি কপালে দিতে

সেবক ও সাধক—সেবার একনিষ্ঠতা—একনিষ্ঠ সেবকের শুশ্রূষায় রোগীর প্রফুল্লভাব

হইবে,—ইত্যাদি, ইত্যাদি। তিনি আস্তে আস্তে নিজে ঐ কাজগুলি করিতে থাকেন, পীড়িতের বদনমণ্ডলে মৃদু-হাস্যের আভা দেখা দেয়, সেবক কৃতার্থ হয়।

শুশ্রূষা-প্রণালীর নির্দ্দেশ—গৃহবাসীর সতর্কতা—স্ত্রীলোকের ভ্রমান্ধতা—রোগের সংক্রামকতা

পরিজন উল্লিখিত ভাবে রোগীর সেবা করিবে। গৃহস্বামী সকলকে সতর্ক করিয়া দিবেন,—যেন পীড়িতের বিছানা, বালিশ, বস্ত্রাদি, বাটীর অপর কাহারও বস্ত্রাদির সহিত না মিশে,—তাহার মল, মূত্র, ক্লেদাদি, বাটী হইতে অধিক দূরে নিক্ষিপ্ত এবং পরিষ্কৃত হয়,—তাহার ব্যবহৃত পাত্রাদি, বাটীর সাধারণ পাত্রাদি হইতে স্বতন্ত্র থাকে এবং সেবকেরা যতদূর পারেন, যে কাপড়ে রোগীর ঘরে থাকেন, সে কাপড় না ছাড়িয়া যেন বাটীর অপর লোকের,—বিশেষতঃ বালক-বালিকাদিগের—ঘনিষ্ঠ সংস্রবে না আইসেন। গৃহস্বামী পীড়ার প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া এই সকল আদেশ দিবেন এবং সমস্ত পরিজন সেই আদেশ পালন করিবে। গৃহস্বামীর আদেশ যে পরিজনেরা পালন করিবে, সে কথা দৃঢ়রূপে বলিবার প্রয়োজন এই যে, স্ত্রীলোকেরা—বিশেষতঃ পীড়িত ছেলের মায়েরা—এই বিষয়ে একটু ভ্রমান্ধ। তাঁহারা ছেলের বিষ্ঠা-মূত্র ঘৃণা করা অকল্যাণকর মনে করিয়া ঐ সকল আদেশ-পালনে শিথিলযত্ন হইয়া থাকেন। বাস্তবিক পীড়িতের মলমূত্রে ঘৃণা-প্রদর্শন হইতেছেনা, কেবল মাত্র সংস্রবদোষ নিবারণের উপায়-বিধান হইতেছে। ছেলের মায়েরা যেন কখনই না ভুলেন যে, এক মাতৃগর্ভসম্ভূত সন্তানদিগের পীড়া আপনাদিগের মধ্যে বড়ই সহজে সংক্রামিত হয়, আর বয়স্কদিগের পীড়া শিশুদিগকে যত শীঘ্র আক্রমণ করে, শিশুর পীড়া বয়স্ককে তত শীঘ্র আক্রমণ করিতে পারেনা। যুবা এবং প্রৌঢ়দিগের পীড়া ও সংক্রামকধর্ম্মী হইয়া থাকে। বৃদ্ধের পীড়াই সর্ব্বাপেক্ষা অল্প সংক্রামক।

# সেকাল ও একাল।

পূর্ব্বে মুসলমানেরা ভারতবর্ষকে আপনাদের গৃহস্বরূপ জ্ঞান করিতেন। তাঁহাদের অনুরাগ এই খানেই বদ্ধ থাকিত। ইংরাজের আমলের প্রথম সাহেবেরা অনেক পরিমাণে ঐরূপ ছিলেন। তাহার এক কারণ এই, তখন বিলাতে যাতায়াতের এমন সুবিধা ছিলনা। যাঁহারা এখানে আসিতেন, তাঁহাদের সর্ব্বদা বাটী যাওয়া ঘটিয়া উঠিতনা। আর এক কারণ এই, তাঁহারা অতি অল্প লোকই এখানে থাকিতেন, সুতরাং এখানকার লোকদিগের সহিত তাঁহারা অনেক পরিমাণে এদেশীয়দের আচার-ব্যবহার পালন করিতেন। তখন সকাল বিকাল কাছারী হইত, মধ্যাহ্ন-কালে সকলে বিশ্রাম করিত। মধ্যাহ্ন-কালে কলিকাতা দ্বিপ্রহর রজনীর ন্যায় নিস্তব্ধ হইত। তখনকার সাহেবেরা পান খেতেন, আলবোলা ফুঁকতেন, ও গুলি খেলতেন। ষ্টুয়ার্ট নামে একজন প্রধান সৈনিক সাহেব ছিলেন, হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ছিল। তজ্জন্য অন্যান্য সাহেবেরা তাঁহাকে হিন্দু ষ্টুয়ার্ট বলিয়া ডাকিত। তাঁহার বাটীতে শালগ্রাম শিলা ছিল। তিনি প্রত্যহ পূজারি ব্রাহ্মণের দ্বারা তাহার পূজা করাইতেন।

এ দেশের প্রতি সেকালের সাহেবদের অনুরাগের কারণ— সেকালের সাহেবদের এ দেশীয় আচার ব্যবহার—হিন্দু ষ্টুয়ার্ট

বাল্যকালে শুনিতাম, কালীঘাটের কালীর মন্দিরে প্রথম কোম্পানীর পূজা হইয়া, তৎপরে অন্যান্য লোকের পূজা হইত। ইহা সত্য না হইতে পারে, কিন্তু ইহা দ্বারা প্রতীত হইতেছে যে, তৎকালের সাহেবেরা বাঙ্গালীদের সহিত এতদূর ঘনিষ্ঠতা করিতেন যে, তাঁহাদিগের ধর্ম্মের পর্য্যন্ত অনুমোদন করিতেন। একালেও

সেকালের সাহেবদিগের এতদ্দেশীয় ধর্ম্মের অনুমোদন—লর্ড এলেনবরার দেবালয়ে দান

গবর্ণর জেনেরল লর্ড এলেনবরা সাহেব বাহাদুর আফগানিস্থানের যুদ্ধে জয়ী হইয়া ফিরিয়া আসিবার সময় বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি স্থানের প্রধান প্রধান দেবালয়ে দান করিয়া আসিয়াছিলেন।

আমলাদের প্রতি দয়া

সেকালের সাহেবেরা আমলাদের উপর এমন সদয় ছিলেন যে, শুনা যায়, তাঁহারা তাঁহাদের দেওয়ানদের বাটিতে গিয়া, তাঁহাদের ছেলে-দিগকে হাঁটুর উপর বসাইয়া আদর করিতেন ও চন্দ্রপুলি খাইতেন। তাঁহারা অন্যান্য আমলাদের বাসায়ও যাইয়া, কে কেমন আছে, জিজ্ঞাসা করিতেন।

চিরস্মরণীয় ইংরাজ মহাপুরুষ-গণের স্মৃতি

পূর্ব্বে যে সকল ইংরাজ মহাপুরুষ এখানে আসিয়া এ দেশের যথেষ্ট উন্নতি করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের নাম এদেশীয়দের হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে। কোন উদ্ভটকবিতাকার, হিন্দু-দিগের প্রাতঃস্মরণীয় স্ত্রীলোকদিগের নাম যে শ্লোকে উল্লিখিত আছে, তাহার পরিবর্ত্তে সেকালের কতিপয় ইংরাজ মহাত্মার নাম উল্লেখ করিয়া একটি শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। আদর্শ ও নকল দুইটি শ্লোকই নিম্নে লিখিত হইল।

আদর্শ :—

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং॥

নকল :—

হেয়ার কল্বিন্ পামরশ্চ কেরি মার্শম্যানস্তথা।
পঞ্চ গোরাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং॥

এই সকল মহাপুরুষের বিষয় অনেকেই অবগত আছেন। ডেবিড্ হেয়ার এই দেশে ঘড়ীর ব্যবসায়দ্বারা লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

হেয়ার, কল্বিন্, পামর, কেরি ও মার্শম্যান

তিনি তাঁহার স্বদেশ স্কট্‌লণ্ডে ফিরিয়া না গিয়া সেই সমস্ত অর্থ এতদ্দেশীয় লোকের হিতসাধনে ব্যয় করিয়া পরিশেষে দরিদ্রদশায় উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রথম প্রবর্ত্তক বলিলে অত্যুক্তি হয়না। তিনি হেয়ার স্কুল সংস্থাপন করেন ও হিন্দুকলেজ সংস্থাপনের একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। আমি তাঁহার একজন ছাত্র ছিলাম। আমি যেন দেখিতেছি, তিনি ঔষধ হস্তে লইয়া পীড়িত বালকের শয্যার পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, অথবা যেখানে যাত্রা হইতেছে, তথায় হঠাৎ আসিয়া অভিনেতা বালককে নীচ আমোদক্ষেত্র হইতে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছেন। কল্বিন্ সাহেব এই কলিকাতা নগরের একজন প্রধান সওদাগর ছিলেন। তিনি অত্যন্ত পরোপকারী ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পুত্র উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর হইয়াছিলেন। তিনি সিপাহী-বিদ্রোহের সময় অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। তিনিও একজন অতি দয়াশীল ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। এতদ্দেশীয়দের প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ স্নেহ ছিল। জন পামরকে লোকে সওদাগরদের রাজা বলিয়া ডাকিত। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার গোরের উপরে “এখানে দরিদ্রজনবন্ধু জন পামর আছেন,” কেবল এই বাক্যটি লিখিত হইয়াছিল। কেরি ও মার্শম্যান্ সাহেব খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন। তাঁহারা শ্রীরামপুরে বাস করিতেন। তাঁহারা বাঙ্গালা অভিধান, বাঙ্গালা সংবাদপত্র ও উন্নত প্রণালীর বাঙ্গালা পাঠশালার স্রষ্টিকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহারা অনেক প্রকারে বঙ্গদেশের মহোপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। সেকালের এই সকল

মহদন্তঃকরণ সাহেব চিরকাল বাঙ্গালীদিগের স্মৃতিক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকিবেন, সন্দেহ নাই।

সেকালের ভট্টাচার্য্যগণের সরলতা ও শাস্ত্রজ্ঞান—রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও বুনো রামনাথ

তখনকার ভট্টাচার্য্যগণ অতি সরলস্বভাব ছিলেন। এখনকার ভট্টাচার্য্য-গণ যেমন বিষয়-বুদ্ধিতে বিষয়ীলোককে অতিক্রম করেন, সে কালের ভট্টাচার্য্যেরা সেরূপ ছিলেননা। তাঁহারা সংস্কৃত শাস্ত্র অতি প্রগাঢ়রূপে জানিতেন এবং অতি সরল ও সদাশয় ছিলেন। সে কালের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সমকালবর্ত্তী রামনাথ নামে একজন পণ্ডিত ছিলেন। তিনি নবদ্বীপের নিকটস্থ একটি গ্রামে বাস করিতেন। তিনি রাজসভা-বিচরণকারী চাটুকার ভট্টাচার্য্যদিগের ন্যায় সভ্যতার নিয়ম পরিজ্ঞাত ছিলেননা। এই জন্য লোকে তাঁহাকে বুনো রামনাথ বলিয়া ডাকিত। একদিন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অমাত্য-সমভিব্যাহারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। রাজা তাঁহার অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে কিছু অর্থসাহায্য করিতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু তাঁহার কি প্রয়োজন, তাহা জানিতে হইবে; এজন্য ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের কিছু অনুপপত্তি আছে?" এখন, ন্যায় শাস্ত্রে অনুপপত্তির অর্থ, যাহার কোন সিদ্ধান্ত হয়না। ভট্টাচার্য্য তাহাই বুঝিয়া লইলেন এবং বলিলেন, "কই, না, আমার কিছু অনুপপত্তি নাই।" রাজা তাহা বুঝিতে পারিয়া অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের কিছু অসঙ্গতি আছে?" এখন, অসঙ্গতি শব্দের ন্যায়শাস্ত্রোল্লিখিত অর্থ অসমন্বয়। ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "না, কিছুই অসঙ্গতি নাই, সকলই সমন্বয় করিতে সমর্থ হইয়াছি।" রাজা দেখিলেন, মহা মুস্কিল। তখন তিনি স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাংসারিক বিষয়ে আপনার কোন অনটন আছে?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, "না, কিছুরই অনটন নাই; আমার

কয়েক বিঘা ভূমি আছে, তাহাতে যথেষ্ট ধান্য উৎপন্ন হয়, আর সম্মুখে এই তিন্তিড়ী বৃক্ষ দেখিতেছেন, ইহার পত্র আমার গৃহিণী দিব্য পাক করেন, অতি সুন্দর লাগে, আমি স্বচ্ছন্দে তাহা দিয়া অন্ন আহার করি।" আমি আশ্চর্য্য বোধ করি যে, এমন সরল, সাধু, সন্তুষ্টচিত্ত ব্যক্তিকে লোকে বুনো বলিত। ইনি যদি বুনো, তবে সভ্য কে ?

অতঃপর সেকালের রাজকর্ম্মচারীদিগের বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। ইংরাজের আমলের প্রথমে আমলাদিগের বড় প্রাদুর্ভাব ছিল। এক একজন আমলার উপর অনেক কর্ম্মের ভার থাকিত। তাঁহারা অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতেন। এক একজন দেওয়ান বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। ঢাকা নগরের একজন দেওয়ানের কথা এরূপ শুনা যায়, তিনি আহারের সময় একটা ঘণ্টা বাজাইয়া দিতেন, নগরের সমুদয় বাসাড়ে লোক সেই ঘণ্টা-রব শুনিয়া তাঁহার বাসায় আসিয়া আহার করিত। তখন ঐ সকল পদ একপ্রকার বংশপরম্পরাগত ছিল। একজন দেওয়ানের মৃত্যু হইলে প্রায়ই তাঁহার সন্তান অথবা অন্য কোন ঘনিষ্ঠসম্পর্কীয় লোক দেওয়ান হইত। শুনা যায়, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামবাসী এক দেওয়ানের মৃত্যুর পর তাঁহার সপ্তদশ বৎসর বয়স্ক কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাণের মাকড়ী ও হাতের বালা খুলিয়া দেওয়ানী করিতে গেলেন। সাহেবেরা তাঁহাদিগের দেওয়ানদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সে সময়ে উৎকোচ লইবার বাড়াবাড়ি ছিল। এখন সেরূপ নাই ; এবিষয়ে অবশ্যই উন্নতি দেখিতেছি।

সেকালের রাজকর্ম্মচারিগণ—আমলাদের বিপুল অর্থোপার্জ্জন—বংশ পরম্পরাক্রমে দেওয়ানী পদপ্রাপ্তি—উৎকোচ-গ্রহণ

পরিশেষে সেকালের ধনী লোকদিগের বর্ণনা করা যাইতেছে। ইঁহারা অত্যন্ত বদান্য ও পুষ্করিণীখননাদি পূর্ত্তকর্ম্মে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন।

তাঁহারা সন্ন্যাসী ও দরিদ্রদিগকে বিলক্ষণ দান করিতেন, অতিথিসেবায় তৎপর ছিলেন, গুণী লোকদিগকে বিলক্ষণরূপে পালন করিতেন এবং ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও প্রসিদ্ধ গায়কদিগকে বিশিষ্ট অর্থানুকূল্য করিতেন। কোন কোন স্থলে উপযুক্ত পাত্রে তাঁহাদিগের দানশীলতা প্রযোজিত হইতনা বটে, কিন্তু তাঁহারা যে অত্যন্ত বদান্য ছিলেন তাহার আর সন্দেহ নাই। সেকালে লোকদিগের ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ আস্থা দৃষ্ট হইত। তাঁহারা যেরূপ বিশ্বাস করিতেন, তদনুরূপ কার্য্য করিতেন।

সেকালের ধনিগণের বদান্যতা ও অন্যান্য সৎকার্য্য—সেকালের লোকের ধর্ম্মবিশ্বাস



# দীপ-নির্ব্বাণ

[ এই আখ্যায়িকাটি বঙ্গজননীর অপূর্ব্ব প্রতিভান্বিত সুসন্তান অমর ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'বিষবৃক্ষ' হইতে সঙ্কলিত এবং উক্ত গ্রন্থের 'নগেন্দ্রের নৌকাযাত্রা' ও 'দীপ-নির্ব্বাণ' শীর্ষক পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত। গোবিন্দপুরের জমিদার নগেন্দ্রনাথ দত্ত জলপথে কলিকাতায় গমনকালে পথিমধ্যে প্রবল ঝড়-বৃষ্টির আক্রমণে বিব্রত হইয়া তীরে অবতরণ পূর্ব্বক আশ্রয়ান্বেষণে পুরোবর্ত্তী গ্রামাভিমুখে গমন করেন। এই আখ্যায়িকায় তাহার পরবর্ত্তী ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশতলে ধারাসিক্ত ধরণীর দৃশ্য কবির তুলিকাপাতে উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। মুমূর্ষু বৃদ্ধের অন্তিমকালও তাহার দারিদ্র্যপীড়িত গার্হস্থ্য জীবনের করুণকাহিনী এবং ছিন্নমলিন শয্যাতলে পাষাণ প্রতিমার ন্যায় নিশ্চল, মৌন, পিতৃবিয়োগবিহ্বলা বালিকার বিষাদ-গম্ভীর চিত্র নিখিল মানবহৃদয় অপূর্ব্ব কারুণ্যরসে অভিষিক্ত ও ভাবসংঘাতে সংক্ষুব্ধ করিয়া তোলে। ]

আকাশে মেঘাড়ম্বরকারণ রাত্রি প্রদোষকালেই ঘনান্ধতমোময়ী হইল। গ্রাম, গৃহ, প্রান্তর, পথ, নদী কিছুই লক্ষ্য হয়না, কেবল বনবিটপী-সকল সহস্র সহস্র খদ্যোতমালা-পরিমণ্ডিত হইয়া হীরকখচিত কৃত্রিম বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। কেবলমাত্র গর্জ্জনবিরত শ্বেত-কৃষ্ণাভ মেঘমালার মধ্যে হ্রস্বদীপ্তি সৌদামিনী মধ্যে মধ্যে চমকিতেছিল। কেবলমাত্র নববারি-সমাগম-প্রফুল্ল ভেকেরা উৎসব করিতেছিল। ঝিল্লীরব মনোযোগপূর্ব্বক লক্ষ্য করিলে শুনা যায়, অশ্রান্তরব করিতেছে, কিন্তু বিশেষ মনোযোগ না করিলে লক্ষ্য হয়না। শব্দের মধ্যে, বৃক্ষাগ্র হইতে বৃক্ষপত্রের উপর বর্ষাবশিষ্ট বারিবিন্দুর পতন-শব্দ, বৃক্ষতলস্থ বর্ষাজলে পত্রচ্যুত জলবিন্দু-পতন-শব্দ, পথিস্থ অনিঃসৃত জলে শৃগালের পদসঞ্চারণ-শব্দ, কদাচিৎ বৃক্ষারূঢ় পক্ষীর আর্দ্র পক্ষের জলমোচনার্থ পক্ষবিধূননশব্দ। মধ্যে মধ্যে শমিতপ্রায়

মেঘাচ্ছন্ন নৈশাকাশতলে বর্ষণ-বিধৌত ধরণীর প্রাকৃতিক দৃশ্য

বায়ুর ক্ষণিক গর্জ্জন, তৎসঙ্গে বৃক্ষপত্রচ্যুত বারিবিন্দুসকলের এককালীন পতনশব্দ।

নগেন্দ্র দূরে একটা আলো দেখিতে পাইলেন। জলপ্লাবিত ভূমি অতিক্রম করিয়া, বৃক্ষচ্যুতবারিকর্ত্তৃক সিক্ত হইয়া, বৃক্ষতলস্থ শৃগালের ভীতি-বিধান করিয়া, নগেন্দ্র সেই আলোকাভিমুখে চলিলেন। বহুকষ্টে আলোক-সন্নিধি উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, এক ইষ্টক-নির্ম্মিত প্রাচীন বাসগৃহ হইতে আলো নির্গত হইতেছে। গৃহের দ্বার মুক্ত। নগেন্দ্র ভৃত্যকে বাহিরে রাখিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, গৃহের অবস্থা ভয়ানক।

নগেন্দ্রের আশ্রয়ান্বেষণে গমন—অলক্ষ্যে গৃহমধ্যে প্রবেশ

গৃহটি নিতান্ত সামান্য নহে। কিন্তু এখন তাহাতে সম্পদ্-লক্ষণ কিছুই নাই। প্রকোষ্ঠসকল ভগ্ন, মলিন, মনুষ্য-সমাগম-চিহ্ন-বিরহিত। কেবলমাত্র পেচক, মূষিক ও নানাবিধ কীট-পতঙ্গাদিসমাকীর্ণ। একটিমাত্র কক্ষে আলো জ্বলিতেছিল। সেই কক্ষমধ্যে নগেন্দ্র প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, কক্ষমধ্যে মনুষ্য-জীবনোপযোগী দুই একটা সামগ্রী আছে মাত্র, কিন্তু সে সকল সামগ্রী দারিদ্র্য-ব্যঞ্জক। দুই একটা হাঁড়ি—একটা ভাঙ্গা উনান—তিন চারিখান তৈজস—ইহাই গৃহালঙ্কার। দেওয়ালে কালী, কোণে ঝুল, চারিদিকে আরসুলা, মাকড়সা, টিকটিকি, ইন্দুর বেড়াইতেছে। এক ছিন্ন শয্যায় একজন প্রাচীন শয়ন করিয়া আছেন। দেখিয়া বোধ হয়, তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত। চক্ষু ম্লান, নিশ্বাস প্রখর, ওষ্ঠ কম্পিত। শয্যাপার্শ্বে গৃহচ্যুত ইষ্টকখণ্ডের উপর একটি মৃন্ময় প্রদীপ, তাহাতে তৈলাভাব; শয্যোপরিস্থ জীবন-প্রদীপেও তাহাই; আর শয্যাপার্শ্বেও আর এক প্রদীপ ছিল,—এক অনিন্দিতগৌরকান্তি স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময়রূপিণী

গৃহ ও গৃহবাসীর অবস্থা

বালিকা! তৈলহীন প্রদীপের জ্যোতিঃ অপ্রখর বলিয়াই হউক, অথবা গৃহবাসী দুইজন আশুভাবী বিরহের চিন্তায় প্রগাঢ়তর বিমনা থাকার কারণেই হউক, নগেন্দ্রের প্রবেশকালে কেহই তাঁহাকে দেখিলনা।

তখন নগেন্দ্র দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া সেই প্রাচীনের মুখনির্গত চরমকালিক দুঃখের কথাসকল শুনিতে লাগিলেন। এই দুইজন—প্রাচীন এবং বালিকা—

পিতা ও পুত্রী

এই বহু লোকপূর্ণ লোকালয়ে নিঃসহায়। একদিন ইহাদিগের সম্পদ্ ছিল, লোক-জন, দাস-দাসী, সহায়-সৌষ্ঠব—সব ছিল। কিন্তু চঞ্চলা কমলার কৃপার সঙ্গে সঙ্গে একে একে সকলই গিয়াছিল। সদ্যঃসমাগত দারিদ্র্যের পীড়নে পুত্রকন্যার মুখমণ্ডল হিমনিষিক্ত পদ্মবৎ দিন দিন ম্লান দেখিয়া অগ্রেই গৃহিণী নদী-সৈকত-শয্যায় শয়ন করিলেন। আর তারাগুলিও সেই চাঁদের সঙ্গে সঙ্গে নিবিল। এক বংশধর পুত্র,—মাতার চক্ষের মণি, পিতার বার্দ্ধক্যের ভরসা,—সেও পিতৃসমক্ষে চিতারোহণ করিল। কেহ রহিলনা, কেবল প্রাচীন আর এই লোকমনোমোহিনী বালিকা সেই বিজনবনবেষ্টিত ভগ্নগৃহে বাস করিতে লাগিল। পরস্পরে পরস্পরের একমাত্র উপায়। কুন্দনন্দিনী বিবাহের বয়স অতিক্রম করিয়াছিল, কিন্তু কুন্দ পিতার অন্ধের যষ্টি, এই সংসার-বন্ধনের একমাত্র গ্রন্থি; বৃদ্ধ প্রাণ ধরিয়া তাহাকে পরহস্তে সমর্পণ করিতে পারিলেননা। "আর কিছুদিন যাক, কুন্দকে বিলাইয়া দিয়া কোথায় থাকিব? কি লইয়া থাকিব?" বিবাহের কথা মনে হইলে, বৃদ্ধ এইরূপ ভাবিতেন। এ কথা তাঁহার মনে হইতনা যে, যেদিন তাঁহার ডাক পড়িবে, সেদিন কুন্দকে কোথায় রাখিয়া যাইবেন। আজি অকস্মাৎ যমদূত আসিয়া শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইল। তিনি ত চলিলেন, কুন্দনন্দিনী কালি কোথায় দাঁড়াইবে?

গভীর অনিবার্য্য যন্ত্রণা মুমূর্ষুর প্রতি নিশ্বাসে ব্যক্ত হইতেছিল। অবিরল মুদিতোন্মুখ নেত্রে বারিধারা পড়িতেছিল। আর শিরোদেশে

বৃদ্ধের অন্তিম যন্ত্রণা ও মৃত্যু—দীপনির্ব্বাণ

প্রস্তরময়ী মূর্ত্তির ন্যায় সেই ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা স্থিরদৃষ্টিতে মৃত্যু-মেঘাচ্ছন্ন পিতৃমুখ-প্রতি চাহিয়াছিল। আপনা ভুলিয়া, কালি কোথা যাইবে তাহা ভুলিয়া, কেবল গমনোন্মুখের মুখপ্রতি চাহিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধের বাক্যস্ফূর্ত্তি অস্পষ্টতর হইতে লাগিল; নিশ্বাস কণ্ঠাগত হইল, চক্ষু নিস্তেজ হইল; ব্যথিত প্রাণ ব্যথা হইতে নিষ্কৃতি পাইল। সেই নিভৃত কক্ষে, স্তিমিত প্রদীপে, কুন্দনন্দিনী একাকিনী পিতার মৃতদেহ ক্রোড়ে লইয়া রহিলেন। নিশা ঘনান্ধকারাবৃতা; বাহিরে এখন ও বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছিল, বৃক্ষপত্রে তাহার শব্দ হইতেছিল। গৃহমধ্যে নির্ব্বাণোন্মুখ, চঞ্চল, ক্ষীণ প্রদীপালোক ক্ষণে ক্ষণে শবমুখে পড়িয়া আবার ক্ষণে ক্ষণে অন্ধকারবৎ হইতেছিল। সে প্রদীপে অনেকক্ষণ তৈলসেক হয় নাই। এই সময়ে দুই চারিবার উজ্জ্বলতর হইয়া প্রদীপ নিবিয়া গেল।



# চিত্রাবলী।

[ সূর্য্যমুখী গোবিন্দপুরের জমিদার নগেন্দ্রনাথ দত্তের স্ত্রী। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহার শয্যাগৃহ ও তন্মধ্যে রক্ষিত কতিপয় চিত্রের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।]

সূর্য্যমুখীর গৃহ অতি প্রশস্ত এবং মনোহর; উহা নগেন্দ্রের সকল সুখের মন্দির; এইজন্য নগেন্দ্র তাহা যত্ন করিয়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কক্ষটি প্রশস্ত এবং উচ্চ, হর্ম্ম্যতল শ্বেতকৃষ্ণ মর্ম্মর প্রস্তরে রচিত। কক্ষপ্রাচীরে নীল, পিঙ্গল, লোহিত লতা-পল্লব-ফল-পুষ্পাদি চিত্রিত; তদুপরি বসিয়া নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিহঙ্গম ফল ভক্ষণ করিতেছে, লেখা আছে। এক পার্শ্বে বহুমূল্য দারুনির্ম্মিত, হস্তিদন্তখচিত কারুকার্য্য-বিশিষ্ট পর্য্যঙ্ক; আর একপার্শ্বে বিচিত্র বস্ত্রমণ্ডিত নানাবিধ কাষ্ঠাসন এবং বৃহদ্দর্পণ প্রভৃতি গৃহ-সজ্জার বস্তু বিস্তর ছিল। কয়খানি চিত্র কক্ষ-প্রাচীর হইতে বিলম্বিত ছিল। চিত্রগুলি বিলাতী নহে; সূর্য্যমুখী ও নগেন্দ্র উভয়ে মিলিত হইয়া চিত্রের বিষয় মনোনীত করিয়া এক দেশী চিত্রকরের দ্বারা চিত্রিত করাইয়াছিলেন। দেশী চিত্রকর একজন ইংরেজের শিষ্য, লিখিয়াছিল ভাল। নগেন্দ্র তাহা বহুমূল্য ফ্রেম্ দিয়া শয্যা-গৃহে রাখিয়াছিলেন।

গৃহ ও গৃহসজ্জা—চিত্রাবলী

এক চিত্রে শ্রীরাম জানকী লইয়া লঙ্কা হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন; উভয়ে এক রত্নমণ্ডিত বিমানে বসিয়া শূন্যমার্গে চলিতেছেন। শ্রীরাম জানকীর স্কন্ধে এক হস্ত রাখিয়া আর এক হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা নিম্নে পৃথিবীর শোভা দেখাইতেছেন। বিমানচতুষ্পার্শে নানাবর্ণের মেঘ—নীল, লোহিত, শ্বেত,—ধূমতরঙ্গোৎক্ষেপ করিয়া বেড়াইতেছে। নিম্নে, আবার বিশাল নীল সমুদ্রে তরঙ্গ-ভঙ্গ

রামসীতার বিমানারোহণে শূন্যমার্গে গমন—নিম্নে পৃথিবী, সমুদ্র, লঙ্কাপুরী ও সমুদ্রবেলার দৃশ্য

হইতেছে, সূর্য্যকরে তরঙ্গসকল হীরকরাশির মত জ্বলিতেছে। একপারে, অতি দূরে, "সৌধকিরীটিনী লঙ্কা",—তাহার প্রাসাদাবলীর স্বর্ণমণ্ডিত চূড়াসকল সূর্য্যকরে জ্বলিতেছে। অপর পারে, শ্যামশোভাময়ী "তমাল-তাল-বনরাজিনীলা" সমুদ্রবেলা। মধ্যে শূন্যে হংসশ্রেণীসকল উড়িয়া যাইতেছে।

উত্তরার নিকটে অভিমন্যুর বিদায়গ্রহণকালীন দৃশ্য

আর এক চিত্রে, রণসজ্জিত হইয়া, সিংহশাবকতুল্য প্রতাপশালী কুমার অভিমন্যু উত্তরার নিকট যুদ্ধযাত্রার জন্য বিদায় লইতেছেন—উত্তরা যুদ্ধে যাইতে দিবেননা বলিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া আপনি দ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন। অভিমন্যু তাঁহার ভয় দেখিয়া হাসিতেছেন, আর কেমন করিয়া অবলীলাক্রমে ব্যূহভেদ করিবেন, তাহা মাটিতে তরবারির অগ্রভাগের দ্বারা অঙ্কিত করিয়া দেখাইতেছেন। উত্তরা তাহার কিছুই দেখিতেছেননা; চক্ষে দুই হাত দিয়া কাঁদিতেছেন।

সত্যভামার তুলাব্রতের দৃশ্য—ব্রতস্থলীর বর্ণনা—তুলাযন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ—সত্যভামার লজ্জা ও ক্রোধ—রুক্মিণীর আনন্দ—শ্রীকৃষ্ণের ভাব—দেবর্ষি নারদ—পৌরবর্গ

আর একখানি চিত্রে সত্যভামার তুলাব্রত চিত্রিত হইয়াছে। বিস্তৃত প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাঙ্গণ, তাহার পার্শ্বে উচ্চসৌধপরিশোভিত রাজপুরী স্বর্ণচূড়ার সহিত দীপ্তি পাইতেছে। প্রাঙ্গণ-মধ্যে এক অত্যুচ্চ রজতনির্ম্মিত তুলাযন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। তাহার একদিকে ভর করিয়া বিদ্যুদ্দীপ্ত নীরদখণ্ডবৎ,নানালঙ্কারভূষিত প্রৌঢ়বয়স্ক দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণ বসিয়াছেন। তুলাযন্ত্রের সেইভাগ ভূমিস্পর্শ করিতেছে; আর একদিকে নানা রত্নাদি সহিত সুবর্ণরাশি স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে, তথাপি তুলাযন্ত্রের সেই ভাগ উর্দ্ধোত্থিত হইতেছেনা। তুলাপাশে সত্যভামা; সত্যভামা প্রৌঢ়বয়স্কা, সুন্দরী, উন্নতদেহা, পুষ্টকান্তি; নানাভরণভূষিতা,

পঙ্কজলোচনা ; কিন্তু তুলাযন্ত্রের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মুখ শুকাইতেছে। তিনি অঙ্গের অলঙ্কার খুলিয়া তুলায় ফেলিতেছেন, হস্তের চম্পকোপম অঙ্গুলির দ্বারা কর্ণবিলম্বী রত্নভূষা খুলিতেছেন, লজ্জায় কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম হইতেছে, দুঃখে চক্ষে জল আসিয়াছে, ক্রোধে নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইতেছে, অধর দংশন করিতেছেন। এই অবস্থায় চিত্রকর তাঁহাকে লিখিয়াছেন। পশ্চাতে দাঁড়াইয়া স্বর্ণপ্রতিমারূপিণী রুক্মিণী দেখিতেছেন ; তাঁহারও মুখ বিমর্ষ ; তিনিও আপনার অঙ্গের অলঙ্কার খুলিয়া সত্যভামাকে দিতেছেন ; কিন্তু তাঁহার চক্ষু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি। তিনি স্বামি-প্রতি অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিয়া, অধরপ্রান্তে ঈষন্মাত্র হাসি হাসিতেছেন ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই হাসিতে সপত্নীর আনন্দ সম্পূর্ণ দেখিতে পাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের মুখ গম্ভীর, স্থির, যেন কিছুই জানেন না ; কিন্তু তিনি অপাঙ্গে রুক্মিণীর প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন, সে কটাক্ষেও একটু হাসি আছে। মধ্যে শুভ্রবসন, শুভ্রকান্তি দেবর্ষি নারদ ; তিনি বড় আনন্দিতের ন্যায় সকল দেখিতেছেন, বাতাসে তাঁহার উত্তরীয় এবং শ্মশ্রু উড়িতেছে। চারিদিকে বহুসংখ্যক পৌরবর্গ নানাপ্রকার বেশভূষা ধারণ করিয়া আলো করিয়া রহিয়াছে। বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ আসিয়াছে ; কত কত পুররক্ষিগণ গোল থামাইতেছে। এই চিত্রের নীচে সূর্য্যমুখী স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছেন,—
"যেমন কর্ম্ম, তেমন ফল ; স্বামীর সঙ্গে সোণারূপার তুলা ?"



## ব্যোমযান ও ব্যোমবিহার।

ব্যোমযানের স্থষ্টিকর্ত্তা মোনগোল্‌ফীর নামক ফরাসী। তিনি প্রথমে কাগজের বা বস্ত্রের গোলক নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে উত্তপ্ত বায়ু পূরিতেন। উত্তপ্ত বায়ু লঘুতর হয়, সুতরাং তৎসাহায্যে গোলকসকল ঊর্দ্ধে উঠিত। আচার্য্য চার্লস্ প্রথমে জলজান-বায়ু-পূরিত ব্যোমযানের স্থষ্টি করেন। তিনি গ্লোব্ নামক ব্যোমযানে উক্ত বায়ু পূর্ণ করিয়া প্রেরণ করেন; তাহাতে সাহস করিয়া কোন মনুষ্য আরোহণ করে নাই। রাজপুরুষেরাও প্রাণিহত্যার ভয়-প্রযুক্ত কাহাকেও আরোহণ করিতে দেন নাই। এই ব্যোমযান কিয়দ্দূর উঠিয়া ফাটিয়া যায়। জলজান বাহির হইয়া যাওয়ায়, ব্যোমযান তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হয়। তারপরে, মোনগোল্‌ফীর আবার আগ্নেয় ব্যোমযান (অর্থাৎ যাহাতে জলজান না পূরিয়া উত্তপ্ত সামান্য বায়ু পূরিতে হয়) বর্ষেল হইতে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু সেবারও মনুষ্য উঠিলনা। সেই রথে চড়িয়া একটি মেষ, একটি কুক্কুট ও একটি হংস পরিভ্রমণে গমন করিয়াছিল। পরে স্বচ্ছন্দে গগনবিহার করিয়া তাহারা সশরীরে মর্ত্ত্যধামে ফিরিয়া আসিয়াছিল। তাহারা পুণ্যবান্, সন্দেহ নাই।

ব্যোমযানের স্থষ্টি—আকাশে ব্যোমযান প্রেরণ—ব্যোমযানের ভূপতন—আগ্নেয় ব্যোমযানে পশু ও পক্ষী আরোহী

দে রোজীরই মনুষ্যমধ্যে প্রথম গগনপর্য্যটক। তাহার পরেই চার্লস্ ও রবার্ট একত্রে ছয় লক্ষ দর্শকের সমক্ষে জলজানীয় ব্যোমযানে উড্ডীন হয়েন এবং প্রায় চতুর্দ্দশ সহস্র ফীট ঊর্দ্ধে উঠেন। ইহার পরে ব্যোমযানারোহণ সচরাচর ঘটিতে লাগিল।

প্রথম ব্যোমবিহারী মনুষ্য

ব্যোমযান অল্প উচ্চে গিয়াই মেঘসকল বিদীর্ণ করিয়া মেঘের আবরণে পৃথিবী দেখা যায়না, অথবা কদাচিৎ দেখা যায়।

ব্যোমযানের উর্দ্ধগমন—মেঘলোক ও গ্রহান্তর হইতে পৃথিবীর দৃশ্য

পদতলে অচ্ছিন্ন, অনন্ত, দ্বিতীয় বসুন্ধরাবৎ মেঘজাল বিস্তৃত। এই বাষ্পীয় আবরণে ভূলোক আবৃত। যদি গ্রহান্তরে জ্ঞানবান্ জীব থাকে, তবে তাহারা পৃথিবীর বাষ্পীয়াবরণই দেখিতে পায়; পৃথিবী তাহাদিগের প্রায় অদৃশ্য। তদ্রূপ আমরাও বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহগণের রৌদ্র-প্রদীপ্ত, রৌদ্র-প্রতিঘাতী, বাষ্পীয় আবরণই দেখিতে পাই, আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের এইরূপ অনুমান।

এইরূপ পৃথিবী হইতে সম্বন্ধরহিত হইয়া, মেঘময় জগতের উপরে স্থিত হইয়া দেখা যায় যে, সর্ব্বত্র জীবশূন্য, শব্দশূন্য, গতিশূন্য, স্থির, নীরব।

মেঘময় জগতে আকাশের দৃশ্য—আকাশের ঔজ্জ্বল্য ও নীলিমার কারণ

মস্তকোপরি আকাশ অতি নিবিড় নীল—সে নীলিমা আশ্চর্য্য। আকাশ বস্তুতঃ চিরান্ধকার—উহার বর্ণ গভীর কৃষ্ণ। অমাবস্যার রাত্রে প্রদীপশূন্য গৃহমধ্যে সকল দ্বার ও গবাক্ষ রুদ্ধ করিয়া থাকিলে যেরূপ অন্ধকার দেখিতে পাওয়া যায়, আকাশের প্রকৃত বর্ণ তাহাই। তন্মধ্যে স্থানে স্থানে নক্ষত্রসকল প্রচণ্ড জ্বালাবিশিষ্ট। কিন্তু নক্ষত্রালোকে অনন্ত আকাশের অনন্ত অন্ধকার বিনষ্ট হয়না,—কেননা, এই সকল প্রদীপ বহুদূরস্থিত। তবে যে আমরা আকাশ অন্ধকারময় না দেখিয়া উজ্জ্বল দেখি, তাহার কারণ বায়ু। সকলেই জানেন, সূর্য্যালোক সপ্তবর্ণময়। স্ফটিকের দ্বারা বর্ণগুলি পৃথক্ করা যায়; সপ্তবর্ণের সংমিশ্রণে সূর্য্যালোক। বায়ু জড় পদার্থ, কিন্তু বায়ু আলোকের পথ রোধ করেনা। বায়ু সূর্য্যালোকের অন্যান্য বর্ণের পথ ছাড়িয়া দেয়, কিন্তু নীলবর্ণকে রুদ্ধ করে। রুদ্ধবর্ণ বায়ু হইতে প্রতিহত হয়। সেই

সকল প্রতিহতবর্ণাত্মক আলোকরেখা আমাদের চক্ষুতে প্রবেশ করায়, আকাশ উজ্জ্বল নীলিমাবিশিষ্ট দেখি, অন্ধকার দেখিনা। কিন্তু যত ঊর্দ্ধে উঠা যায়, বায়ুস্তর তত ক্ষীণতর হয়, গাগনিক উজ্জ্বল নীলবর্ণ ক্ষীণতর হয়, আকাশের কৃষ্ণত্ব কিছু কিছু সেই আবরণ ভেদ করিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্ম ঊর্দ্ধলোকে গাঢ় নীলিমা।

শিরে এই গাঢ় নীলিমা—পদতলে, তুঙ্গশৃঙ্গবিশিষ্ট পর্ব্বতমালায় শোভিত মেঘলোক—সে পর্ব্বতমালা ও বাষ্পীয়—মেঘের পর্ব্বত,—পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত, তদুপরি আর ও পর্ব্বত,—কেহ বা কৃষ্ণমধ্য, পার্শ্বদেশে রৌদ্রের প্রভা-বিশিষ্ট, —কেহ বা রৌদ্রস্নাত, কেহ যেন শ্বেত-প্রস্তর-নির্ম্মিত; কেহ যেন হীরক-নির্ম্মিত। এই সকল মেঘের মধ্য দিয়া ব্যোমযান চলে। তখন নীচে মেঘ, উপরে মেঘ, দক্ষিণে মেঘ, বামে মেঘ, সম্মুখে মেঘ, পশ্চাতে মেঘ। কোথাও বিদ্যুৎ চমকিতেছে, কোথাও ঝড় বহিতেছে, কোথাও বৃষ্টি হইতেছে, কোথাও বরফ পড়িতেছে। মস্যুর ফনবিল একবার একটি মেঘ-গর্ভস্থ রন্ধ্র দিয়া ব্যোমযানে গমন করিয়াছিলেন; তাঁহার কৃত বর্ণনা পাঠ করিয়া বোধ হয়, যেমন মুঙ্গেরের পথে পর্ব্বত-মধ্য দিয়া বাষ্পীয় শকট গমন করে, তাঁহার ব্যোমযান মেঘ-মধ্য দিয়া সেইরূপ গমন করিয়াছিল।

মেঘলোকে ব্যোমবিহার—মেঘলোকের দৃশ্য

এই মেঘলোকে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত অতি আশ্চর্য্য দৃশ্য; ভূলোকে তাহার সাদৃশ্য অনুমিত হয়না। ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া অনেকে একদিনে দুইবার সূর্য্যাস্ত দেখিয়াছেন এবং কেহ কেহ একদিনে দুইবার সূর্য্যোদয় দেখিয়াছেন। একবার সূর্য্যাস্তের পর রাত্রি-সমাগম দেখিয়া আবার ততোধিক ঊর্দ্ধে উঠিলে দ্বিতীয়বার সূর্য্যাস্ত দেখা

মেঘলোকে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত

যাইবে, এবং একবার সূর্য্যোদয় দেখিয়া আবার নিম্নে নামিলে সেই দিন দ্বিতীয়বার সূর্য্যোদয় অবশ্য দেখা যাইবে।

ব্যোমযান হইতে পৃথিবীর দৃশ্য

ব্যোমযান হইতে যখন পৃথিবী দেখা যায়, তখন উহা বিস্তৃত মানচিত্রের স্থায় দেখায়; সর্ব্বত্র সমতল—অট্টালিকা, বৃক্ষ, উচ্চভূমি এবং অভ্রোন্নত মেঘ যেন সকলই অনুচ্চ, সকলই সমতল ভূমিতে চিত্রিতবৎ দেখায়। নগর সকল যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গঠিত প্রতিকৃতি, চলিয়া যাইতেছে, বোধ হয়। বৃহৎ জনপদ উদ্যানের মত দেখায়। নদী শ্বেত সূত্র বা উরগের মত দেখায়। বৃহৎ অর্ণবযানসকল বালকের ক্রীড়ার জন্য নির্ম্মিত তরণীর মত দেখায়। যাঁহারা লণ্ডন বা পারিস্ নগরীর উপর উত্থান করিয়াছেন, তাঁহারা দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা প্রশংসা করিয়া ফুরাইতে পারেন নাই। গ্লেশর সাহেব লিখিয়াছেন যে, তিনি লণ্ডনের উপর উঠিয়া এককালে ত্রিশলক্ষ মনুষ্যের বাসগৃহ নয়নগোচর করিয়াছিলেন। রাত্রিকালে মহানগরীসকলের রাজপথস্থ দীপমালা অতি রমণীয় দেখায়।

বায়ুর গতি নির্ণয় পূর্ব্বক তৎসাহায্যে ব্যোম-বিহার

১৮৬৮ সালের আগষ্ট মাসে মস্থর তিসান্দর কালে নগর হইতে বেলুনে গগনারোহণ করেন; তিনি চারি ফিট্ উর্দ্ধে উঠিয়া দেখিলেন যে, তাঁহাদিগের গতি উত্তর-সমুদ্রে। অপরাহ্নে তাঁহারা অকস্মাৎ অনিচ্ছার সহিত অনন্ত সাগরের উপর যাত্রা করিলেন। কিন্তু তখন উপায়ান্তর ছিলনা। এই সঙ্কটে তাঁহারা দেখিলেন যে, নিম্নে মেঘ সকল দক্ষিণগামী। তখন তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়া সমুদ্রবিহারে চলিলেন। এইরূপে তাঁহারা দুই এক মাইল পর্য্যন্ত সমুদ্রোপরি বাহির হইয়া যান। তাহার পর লঘু বায়ু নির্গত করিয়া দিয়া

নীচে নামেন। বায়ুর সেই নিম্নস্তরে দক্ষিণ বায়ু পাইয়া তৎকর্ত্তৃক বাহির হইয়া পুনর্ব্বার ভূমির উপরে আসেন। কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ অবতরণ করেন নাই। তারপর সন্ধ্যা হইয়া অন্ধকার হইল। বাষ্পের গাঢ়তা-বশতঃ নিম্নে ভূতল দেখা যাইতেছিলনা। এমন অবস্থায় তাঁহারা কোথায় যাইতেছিলেন, তাহা জানিতে পারেন নাই। অকস্মাৎ নিম্ন হইতে গভীর সমুদ্র-কল্লোল উত্থিত হইল। তখন অন্ধকারে পুনর্ব্বার অনন্ত সাগরোপরি বিচরণ করিতেছেন জানিতে পারিয়া তাঁহারা আবার নিম্নে নামিলেন। আবার দক্ষিণ বায়ুর সাহায্যে ভূমি প্রাপ্ত হইলেন।

মেঘলোকে ছায়া-দৃশ্য

উত্তর-সমুদ্রে বিচরণ কালে তাঁহারা কয়েকটি অদ্ভুত ছায়া দেখিয়াছিলেন। দেখিলেন যে, সমুদ্রে যে সকল বাষ্পীয় জাহাজাদি চলিতেছিল, ঊর্দ্ধে মেঘমধ্যে তাহার প্রতিবিম্ব। মেঘ-মধ্যে তেমনি সমুদ্র চিত্রিত হইয়াছে—সেই চিত্রিত সমুদ্রে তেমনি প্রকৃত জাহাজের ন্যায় ছায়ার জাহাজ চলিতেছে। সেই সকল জাহাজের তলদেশ ঊর্দ্ধে, মাস্তুল নিম্নে; বিপরীত ভাবে জাহাজ চলিতেছে। মেঘরাশি বৃহদ্দর্পণস্বরূপ সমুদ্রকে প্রতিবিম্বিত করিতেছে।

আশ্চর্য্য প্রতিবিম্ব দর্শন—প্রতিবিম্বের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী জ্যোতির্ম্মণ্ডল—জলবাষ্পোপরি প্রতিসৌরবিম্ব

মস্যুর ফ্লামারিয় আর একটি আশ্চর্য্য প্রতিবিম্ব দেখিয়াছিলেন। দিবাভাগে প্রায় পাঁচ সহস্র ফিট ঊর্দ্ধে আরোহণ করিয়া দেখিলেন, তাঁহাদিগের প্রায় শত ফিট মাত্র দূরে, দ্বিতীয় একটি বেলুন চলিয়াছে। আরও দেখিলেন, সেই দ্বিতীয় বেলুনটির আকৃতি তাঁহাদিগের বেলুনেরই আকৃতি;—যেমন তাঁহাদিগের বেলুনের নিম্নে "রথ" যুক্ত ছিল, এবং তাহাতে দুইজন আরোহী বসিয়াছিলেন, দ্বিতীয় বেলুনেও সেইরূপ রথ, এবং সেইরূপ দুইজন

আরোহী। আরও বিস্মিত হইয়া দেখিলেন যে, সেই দুইজন আরোহীর অবয়ব তাঁহাদিগেরই অবয়ব। তাঁহারাই সেই দ্বিতীয় বেলুনে বসিয়া আছেন। একটি বেলুনে যেখানে যাহা ছিল—যেখানে যে দড়ি,—যেখানে যে সূতা,—যেখানে যে যন্ত্র, দ্বিতীয় বেলুনে ঠিক তাহাই আছে। ফ্লামারিয় দক্ষিণ হস্তোত্তোলন করিলেন—ভৌতিক ফ্লামারিয় বাম হস্তোত্তোলন করিল। তাঁহার সঙ্গী একটি পতাকা উড়াইলেন, ভৌতিক সঙ্গী একটা তদ্রূপ পতাকা উড়াইলেন। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সেই ভৌতিক ব্যোমযানের ভৌতিক রথের চতুষ্পার্শ্বে অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল-সকল প্রতিভাত হইতেছিল। মধ্যে হরিৎ শ্বেতাভ মণ্ডল, তন্মধ্যে রথ; তৎপার্শ্বে ক্ষীণ নীল মণ্ডল; তাহার বাহিরে হরিদ্রাবর্ণ মণ্ডল; তৎপরে কপিশ রক্তাভ মণ্ডল; শেষে অতসীকুসুমবৎ বর্ণ; তাহা ক্রমে ক্ষীণতর হইয়া মেঘের সঙ্গে মিশাইয়া গিয়াছে। এই বৃত্তান্ত বুঝাইবার স্থান এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে হইতে পারেনা; ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহা জলবাষ্পের উপর প্রতিসৌরবিম্ব মাত্র।

গগনপথে পার্থিবশব্দ সহজে গমন করে, কিন্তু সকল সময়ে নহে, এবং সকল শব্দের গতি তুল্যরূপ নহে। মেঘাচ্ছন্নে শব্দরোধ ঘটে।

গগন-পথে পার্থিবশব্দের গতি-বৈচিত্র্য

গ্লেশর সাহেব চারি মাইল ঊর্দ্ধ হইতে রেইলওয়ে ট্রেণের শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন এবং বিশ হাজার ফিট উপরে থাকিয়া কামানের শব্দ শুনিয়াছিলেন। একটি ক্ষুদ্র কুকুরের রব দুই মাইল উপর হইতে শুনিতে পাইয়াছিলেন; কিন্তু চারি হাজার ফিট্ উপরে থাকিয়া বহুসংখ্যক মনুষ্যের কোলাহল শুনিতে পান নাই। মস্যুর ফ্লামারিয় আকাশ হইতে ভূমণ্ডলের বাদ্য শুনিতে পাইতেন। তাঁহার বোধ হইত যেন মেঘ মধ্যে কে সঙ্গীত করিতেছে।

অনেকেই অবগত আছেন যে, যখন পারিস্ অবরুদ্ধ হয়, তখন ব্যোমযানযোগে পারিস্ হইতে গ্রাম্য প্রদেশে ডাক যাইত। শিক্ষিত পারাবতসকল সেই সকল ব্যোমযানে চড়িয়া যাইত। তাহাদের পুচ্ছে উত্তর বাঁধিয়া দিলে লইয়া ফিরিয়া আসিত। লঘুতার অনুরোধে সেই সকল পত্র ফটোগ্রাফের সাহায্যে অতি ক্ষুদ্রাকারে লিখিত হইত—অতি বৃহৎ পত্র এক ইঞ্চির মধ্যে সমাবিষ্ট হইত। পড়িবার সময়ে অণুবীক্ষণ ব্যবহার করিতে হইত।

ব্যোমযানারোহী পারাবতের সংবাদ-বহন



## আমোদ ও হাস্য।

যে গৃহে আমোদ নাই, তাহা কারাগারের ন্যায়, সেখানে শরীর, মন দুইই নিষ্প্রভ হয়। পরমেশ্বর পৃথিবীকে নানাপ্রকার সুখের আবাসরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন; মনুষ্য-জীবন ধারণ করিয়া যে ব্যক্তি সন্তুষ্টচিত্তে কালযাপন না করে, সে অতি অকৃতজ্ঞ; সেই জন্য সর্ব্বদাই যথাপরিমাণে নির্দ্দোষ আমোদ সম্ভোগ করিবে।

আমোদের প্রয়োজনীয়তা—নির্দ্দোষ আমোদোপভোগের শিক্ষা ও চেষ্টা—ভ্রমণজনিত আনন্দ

কিন্তু কোন্ প্রকার আমোদ নির্দ্দোষ, কোন্ প্রকার নহে, এ বিষয় সাবধানে বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। সঙ্গীতের তুল্য উৎকৃষ্ট আমোদ পৃথিবীতে অতি অল্পই আছে; কিন্তু বহুকালাবধি তাহা নির্দ্দোষ নহে। যাহাতে এই উচ্চ আনন্দ নির্ম্মল চিত্তে সেবন করিতে পার, তজ্জন্য শিক্ষাও চেষ্টার ত্রুটি করিবেনা। শরীর-চালনায় ও নির্দ্দোষ বায়ু-সেবনে অনেক সুখ আছে। যাহারা সর্ব্বদা গৃহ-মধ্যে বদ্ধ থাকে, তাহারা মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ করিলে অপূর্ব্ব সুখানুভব করে। অতএব মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণের অভ্যাস সকলের পক্ষেই আনন্দপ্রদ।

গৃহস্থের পক্ষে মধ্যে মধ্যে কোন প্রকার আনন্দকর পারিবারিক অনুষ্ঠান নিতান্ত কর্ত্তব্য। এই জন্য এতদ্দেশে যাগ, যজ্ঞ, পূজা ও নানাপ্রকার পর্ব্বাদির বিধি আছে। স্বাস্থ্যের পক্ষে, শারীরিক স্বচ্ছন্দতার পক্ষে, পরিবারের কুশলের পক্ষে, এ প্রকার উৎসব অপরিহার্য্য।

আনন্দজনক অনুষ্ঠান ও তাহার প্রয়োজনীয়তা

যাহার সর্ব্বদা মুখ ভার ও মন ভার, তাহার স্বভাবে মনুষ্যত্ব অতি অল্প; যে সর্ব্বদা প্রফুল্ল, সে মনুষ্য-সমাজের ভূষণস্বরূপ, তাহাকে দেখিয়া লোকে প্রীত হয়। যত দূর পার আনন্দ কর, সন্তাপ করিও না; হাস্য

কর, রোদন করিও না ; যাহাতে লোকের প্রীতি হয়, তাহাই কর, যাহাতে অপ্রীতি জন্মে, তাহা করিওনা। সুমিষ্ট সুশোভন ফুল লইয়া আঘ্রাণ কর ও বিতরণ কর, সুপক্ক সুবর্ণ ফল লইয়া আহার কর ও লোককে আহার করাও, সুবিশাল প্রশান্তসলিল নদীতটে গিয়া বিচরণ কর, নির্ম্মল-সুস্নিগ্ধ-বায়ু-সঞ্চারিত শ্যামল প্রান্তরে ভ্রমণ করিয়া সুখী হও। সুনিপুণ শিল্পকার্য্য, উৎকৃষ্ট চিত্র, উন্নত অট্টালিকা, কৌশলপূর্ণ প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দিত হও। আত্মীয় ও প্রিয় বন্ধুবান্ধবদিগের সঙ্গে সহবাস করিয়া আহ্লাদিত হও, বিবাদ করিওনা, অসুখী হইওনা, শান্তিভঙ্গ করিওনা। ঈশ্বরকে ভক্তি করিয়া, গুরুজনকে শ্রদ্ধা-সম্মান করিয়া, জ্ঞানধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়া আনন্দিত হও। ইহজীবনে দয়াময় পরমেশ্বর সুখশান্তির সহস্র দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়াছেন ; যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে, আনন্দিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে ; দেহান্ত হইলে পরলোকে আনন্দ সম্ভোগ করিবার সম্পূর্ণ আশা ও বিশ্বাস আছে।

বিষাদ ও প্রফুল্লতা—আনন্দলাভার্থে কর্ম্মানুষ্ঠান—ইহলোক ও পরলোকে আনন্দভোগের আশা।

পৃথিবীমধ্যে অনেক জীব বাস করে। তাহাদের রূপের গুণের সীমা নাই, কিন্তু মনুষ্য ব্যতীত হাস্য করিবার অধিকার আর কোন জীবকে দেওয়া হয় নাই। যদি আমাদের জীবনে, আমাদের পরিবারে, আমাদের লোক-সমাজে হাসি না থাকিত, তাহা হইলে মনুষ্য-স্বভাবের অর্দ্ধেক শোভা অদৃশ্য হইত। এই হাস্য একটি মহাশক্তি ; এতদ্বারা যে কত জড়তা, মনঃপীড়া, অপ্রেম, সন্দেহ নিমেষের মধ্যে বিদূরিত হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায়না। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষে এই হাসির মর্য্যাদার

হাস্যে একমাত্র মনুষ্যের অধিকার—হাসির শোভা ও শক্তি—ব্যক্তিভেদে হাসির প্রকৃতিভেদ—সঙ্গত কারণ-সম্ভূত হাসির স্বরূপ

তারতম্য হইয়া থাকে। একজন হীনবল, তরলচেতা, তোষামোদকারী ব্যক্তির হাস্যে হয়তো আমরা বিরক্ত হই, একজন মহাপবিত্র উন্নতপ্রকৃতি ব্যক্তির গম্ভীর হাস্য প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় আমাদিগকে পুলকিত করে। যিনি উপযুক্ত কারণে হাসিতে জানেন, তিনি জন-সমাজের মুখোজ্জ্বল করেন; তিনি আপনার গৃহে শান্তিরক্ষা করিতে পারেন, শ্রান্তিভারাক্রান্ত জীবনকে লঘু করিতে পারেন, জনসমাজের বিবাদ ভঞ্জন করিতে সমর্থ হন, এবং আপনার প্রকৃতিকে সর্ব্বদা সাম্যাবস্থায় রাখিতে পারেন।

নারীর হাস্য ও ক্রন্দন—সকল অবস্থায় হাসির প্রয়োগ—হাসির অনুশীলন

ক্রন্দন করার ন্যায় হাস্য করা নারী চরিত্রে অতিশয় সুলভ; কিন্তু কোন নারী যতবার ও যতপ্রকার অভিপ্রায়ে অশ্রুবর্ষণ করেন, বোধ করি ততবার হাস্য করেননা। ইহাকে শিক্ষার দোষ বলিতে হইবে। যদি ধনের অভাব হয়, স্বকর্ত্তব্য পালন করিয়া ধনোপার্জ্জন কর, কিন্তু দারিদ্র্যের মনস্তাপ হাসিয়া উড়াইয়া দাও। যদি রোগ হইয়া থাকে, সমুচিত চিকিৎসা আরম্ভ কর, কিন্তু রোগ-যাতনায় অধীর হইয়া চীৎকার করিওনা; প্রফুল্লচিত্তে, প্রফুল্লমুখে, সহাস্যভাবে রোগযাতনাকে সম্বরণ করিতে শিক্ষা কর। যদি লোকে অপমান কিম্বা নির্য্যাতন করিবার চেষ্টা করে, অত্যাচারীর সঙ্গে কলহ করিও না, তাহার কার্য্যে সায় দিও না, কিন্তু সহাস্য মুখে সে দুর্ব্যবহার বহন করিয়া আপনার কর্ত্তব্য অকুতোভয়ে পালন কর। সকলের সহিত সহাস্যমুখে কথা কও, কাহারও প্রতি বিরক্ত হইলেও সহজে বিরক্তি প্রকাশ করিওনা। দাস দাসীদের সহিত প্রসন্নমুখে ব্যবহার কর। হাস্যকে শিক্ষার বিষয় কর, সাধনের বিষয় কর। যেমন স্বভাবের অপরাপর গুণের শিক্ষা ও অনুশীলন আছে, তেমনি এই হাস্যগুণকে উপযুক্তরূপে ব্যবহার করিতে গেলে শিক্ষার আবশ্যকতা হয়। তবে ইহা যেন মনে

থাকে—কোনরূপ শিক্ষাই স্বভাবকে অতিক্রম করেনা। প্রকৃত শিক্ষাদ্বারা স্বভাব পরিস্ফুট হয়, বিকার প্রাপ্ত হয়না।

অপরিমিত হাস্য সর্ব্বদাই দূষণীয়। বত্রিশ দন্ত বাহির করিয়া হা হা, হি হি রবে গৃহ প্রতিধ্বনিত করিলে কুরুচি ও অসভ্যতার পরিচয় দেওয়া হয়। কখনো কেবল দশনপাঁতি হাস্য করে, কখনো সমুদয় মুখমণ্ডল হাসে, সমুদয় দেহমণ্ডল হাসে; না হাসিয়াও মেঘাবৃত চন্দ্রমাতুল্য চতুর্দ্দিকে আনন্দ-কিরণ বৃষ্টি করিতে থাকে। যাহার হাস্য অত্যুচ্চ, প্রায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, তাঁহার ক্রন্দন ও অত্যুচ্চ, তাহার কলহ ও অত্যুচ্চ। অতএব হাস্যসংবরণ করিতে শিক্ষা করিবে। লজ্জা, গাম্ভীর্য্য, সভ্যতা, সুশীলতা এই সকল সীমার মধ্যে প্রবল হাস্যপ্রবৃত্তিকে সাবধানে সঙ্কুচিত করিবে।

অপরিমিত হাস্যের দোষ—বিবিধ প্রকারে হাস্যের অভিব্যক্তি—উচ্চহাস্য ও হাস্য-সংযম

মানুষ সুপ্রসন্ন চিত্ত হইলে তাহার প্রকৃতির উপর এক আশ্চর্য্য সুমিষ্ট শোভা প্রকাশিত হয়। উত্তেজনার অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া যায়, তিক্ত ভাব সকল চলিয়া যায়। সকল সময়ে, সকল অবস্থাতেই সুমিষ্টভাবে কালযাপন করিবে।

প্রসন্নচিত্ততার ফল





# তৃতীয় স্তবক।

# প্রবন্ধ-পরিচয়।

## নর্ম্মদা—নবীনচন্দ্র সেন।

এই প্রবন্ধ অপূর্ব্বপ্রতিভাম্বিত অমর কবি নবীনচন্দ্রের অমৃতময়ী লেখনীপ্রসূত "প্রবাসের পত্র" হইতে সঙ্কলিত। নবীন বাবু ভারতের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণকালে তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে যে সকল পত্র লিখেন, তাহার অধিকাংশ প্রথমে সাহিত্য পত্রে প্রকাশিত ও পরে ১২৯৯ সালে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। নবীনচন্দ্রের কবিতার ন্যায় এই প্রবাস-চিত্রটী ও সরল পদ লালিত্য ও বর্ণনা-মাধুর্য্যে চিত্তহারী হইয়াছে।

## ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—শিবনাথ শাস্ত্রী।

এই সন্দর্ভ "প্রবন্ধাবলি" হইতে সঙ্কলিত। এই গ্রন্থে বিবিধ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত পনরটি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্রের কতিপয় বিশেষত্ব প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় আলোচিত হইয়াছে। প্রবন্ধটি লেখকের আন্তরিকতা, সরলতা ও চিন্তাশীলতার পরিচায়ক।

## উপাসনা—রমেশচন্দ্র দত্ত।

এই প্রবন্ধ ১২৮০ সালে প্রকাশিত "বঙ্গবিজেতা" নামক সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসের "উপাসকে উপাসকে" শীর্ষক 'নবম পরিচ্ছেদ' হইতে গৃহীত। ভাবের গাম্ভীর্য্য, প্রগাঢ়তা ও বিশুদ্ধিতা, ভাষার ওজস্বিতা ও কমনীয়তা এবং বর্ণনার মধুরতা ও হৃদয়গ্রাহিতায় প্রবন্ধটি সাতিশয় চিত্তাকর্ষক ও সুখপাঠ্য হইয়াছে।

## ভীষ্মদেব—ব্রজনাথ বিশ্বাস।

এই প্রবন্ধে কুরুকুলবৃদ্ধ ভীষ্মদেবের অলোক-সাধারণ চরিত্র ওজস্বিনী ও হৃদয়স্পর্শী ভাষায় সাতিশয় নৈপুণ্য সহকারে আলোচিত হইয়াছে।

## হিমালয়—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

এই প্রবন্ধ "বাল্মীকির জয়" নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। "বাল্মীকির জয়" প্রথমে ধারাবাহিকভাবে "বঙ্গদর্শন" পত্রে প্রকাশিত ও পরে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। আর, আর, সেন 'The Triumph of Valmiki' নামে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থের

ইংরাজী অনুবাদ করেন। ভাষার প্রাঞ্জলতা ও বর্ণনা-লালিত্যে বর্ত্তমান প্রবন্ধটি সাতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

### আরবদেশ ও আরবজাতি—কৃষ্ণকুমার মিত্র।

এই প্রবন্ধ "মহম্মদ চরিত" হইতে সঙ্কলিত। ইহাতে মহাপুরুষ মোহম্মদের অভ্যুদয়কালের পূর্ব্ববর্ত্তী আরবদেশ ও আরব জাতির অবস্থা ওজস্বিনী ও মনোহারিণী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। প্রবন্ধটি পাঠ করিতে করিতে প্রাচীন আরবের একটি সজীব, সমুজ্জ্বল আলেখ্য মানস-নয়ন সমক্ষে প্রতিভাসিত হইয়া উঠে।

### মধুসূদনের উচ্চাভিলাষ ও অধ্যয়নাসক্তি—যোগীন্দ্রনাথ বসু।

এই প্রবন্ধ "মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত" গ্রন্থের "বাল্যজীবন" শীর্ষক প্রথম অধ্যায় হইতে পরিগৃহীত। ইহাতে মাইকেলের আবাল্যপোষিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও প্রগাঢ় অধ্যয়নাসক্তির প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

### মধুসূদনের জন্মভূমির সৌন্দর্য্য—যোগীন্দ্রনাথ বসু।

এই প্রবন্ধও মধুসূদনের জীবন চরিতের প্রথম অধ্যায় হইতে সঙ্কলিত। ইহাতে তাঁহার জন্মভূমি সাগরদাঁড়ির একটি মনোরম চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। প্রতিভাশালী লেখকের নিপুণ তুলিকাস্পর্শে এই মনোজ্ঞ পল্লীচিত্র সরলতা, সৌন্দর্য্য ও বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

### মোগল সম্রাটগণের বিদ্যানুরাগ—হরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

এই সন্দর্ভ ১৩০০ সালের পৌষ মাসের 'সাহিত্য' পত্রে প্রকাশিত "আকবর সাহের বাল্যশিক্ষা" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত। ইহাতে প্রধানতঃ আকবর সাহের এবং প্রসঙ্গতঃ তৈমুর, বাবর ও হুমায়ুনের বিদ্যোৎসাহিতা ও জ্ঞানানুশীলনের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ভাষার প্রাঞ্জলতা ও বিষয়ের সারবত্তায় প্রবন্ধটি উপাদেয় ও সুখপাঠ্য হইয়াছে।



# নর্ম্মদা।

নর্ম্মদার জলপ্রপাত—প্রাকৃতিক দৃশ্য

একদিন মাত্র নাসিকে থাকিয়া, ছাব্বিশ ঘণ্টা রেলে কাটাইয়া, আমরা অবসন্ন প্রাণে জব্বলপুর পঁহুছি। পরদিন প্রাতে আমি নর্ম্মদা দর্শন করিতে যাই। জব্বলপুর হইতে এস্থান এগার মাইল ব্যবধান; পথ অতি সুন্দর এবং ছায়াসমাচ্ছন্ন। প্রথমেই নর্ম্মদার জলপ্রপাত দেখিতে যাই। স্থানীয় লোকেরা ইহাকে 'ধূমধারা' বলে। ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে, প্রস্তরগর্ভে বেগে জলধারা পড়িয়া যে জলকণা উৎকীর্ণ করে, তাহা দূর হইতে ঠিক ধূমের মত বোধ হয়। সেইজন্য এই জলপ্রপাতের নাম ধূমধারা হইয়াছে। উভয় পার্শ্বে শ্বেত শৈলশ্রেণী। তাহাদের পাদমূল প্রক্ষালন করিয়া, প্রস্তরগর্ভা নর্ম্মদা প্রবাহিতা।

নর্ম্মদার অন্য নাম রেবা। অনুমান পঞ্চাশ হস্ত ঊর্দ্ধ হইতে, বহুধারায় গর্জ্জন করিয়া, নর্ম্মদা ভীষণবেগে পতিত হইয়া, এই অপূর্ব্ব জলপ্রপাত সৃষ্টি করিয়াছেন। নর্ম্মদা যেন অবিরাম সংখ্যাতীত শ্বেতকুন্দকুসুমরাশি বর্ষণ করিয়া বিন্ধ্যপাদ পূজা করিতেছেন। জল তুষারবৎ শীতল। তথাপি এই প্রাকৃতিক কবিত্ব-স্রোতে অবগাহন না করিয়া আমি থাকিতে পারিলামনা। প্রপাতের নীচে নামিবার সাধ্য নাই।

উপরিভাগে বসিয়াও স্নান করিবার সময় আমি স্থির থাকিতে পারিলামনা। স্রোতের বেগ এত প্রখর, কিন্তু জলের গভীরতা চারি আঙ্গুলের অধিক নহে।

গৌরীশঙ্কর মন্দির

ফিরিবার সময়ে, গৌরীশঙ্কর দর্শন করি। জলপ্রপাত হইতে এই মন্দির পর্য্যন্ত, গিরিমূল অসংখ্য আমলকী, বেল ও নানাবিধ বনজাত ফলবৃক্ষে সমাচ্ছন্ন। দেখিলে, ঋষিদিগের পুরাতন আশ্রমের চিত্র মনে পড়ে। আমি কোনও কোনও ফল খাইয়া দেখিলাম। মন্দিরটি একটি শৃঙ্গে অবস্থিত। ইহা এক সময়ে গৌরবাপন্ন ছিল, সন্দেহ নাই।

মর্ম্মর পর্ব্বত ও উপত্যকা-ভূমি

পর্ব্বতের সানুদেশ হইতে নর্ম্মদার উভয়তীরস্থ শৈলমালা ও উপত্যকার শোভা মনোমুগ্ধকর। পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া আমি ভারত বিখ্যাত 'মার্ব্বল-রক্' বা মর্ম্মর পর্ব্বত দেখিতে যাই। এখানে নর্ম্মদার উভয় তীরস্থ পর্ব্বতই মর্ম্মর, কিন্তু উপরিভাগ তৃণ-গুল্মসমাচ্ছন্ন এবং বৃষ্টির দ্বারা বিবর্ণ হইয়াছে। সেরূপ অমল শ্বেতবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়না।

প্রাকৃতিক সরোবর

জলপ্রপাত হইতে কিঞ্চিৎ দূরে জলপতনবেগে গর্ভস্থ প্রস্তর কাটিয়া একটি দীর্ঘাকার বিচিত্র সরোবর হইয়াছে। যেস্থানে স্বয়ং প্রকৃতিই শিল্পী, সেস্থানে তাহার বিচিত্রতা এবং শোভার কথা কি বলিব? গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এখানে দুটি বাঙ্গালা এবং দুখানি প্লেজার বোট বা আমোদতরণী রক্ষিত হইয়াছে। তীরস্থিত গৃহ দুইখানি যেন দুখানি ছবি।

আমি একখানি জালিবোটে নর্ম্মদার গর্ভে বেড়াইতে লাগিলাম। আমি ইহার কি বর্ণনা করিব? অমল ধবল হইতে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, এব উভয় বর্ণের সংমিশ্রিত নানাবর্ণের মর্ম্মর-শৈলশ্রেণী উভয় পার্শ্বে সরলভাবে

মধ্যাহ্ন-রবিকরে কি মহিমাপূর্ণ শোভা ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পদতলে ঘুরিয়া ফিরিয়া নীল, তরল অমৃতখণ্ডের মত নর্ম্মদার গর্ভস্থ সরসী শোভা পাইতেছে। তাহার উভয় পার্শ্বে নানাবর্ণের মর্ম্মর প্রাচীরের ছায়া সেই নীলদর্পণে প্রতিভাত হইয়া, নানাবর্ণের মেঘমালায় খচিত একখণ্ড আকাশের মত শোভা পাইতেছে। স্থানে স্থানে মর্ম্মর-গর্ভে কি সুন্দর সুন্দর কক্ষই নির্ম্মিত হইয়া রহিয়াছে। কক্ষ-প্রাচীর শ্বেত মর্ম্মরের, কক্ষতল নর্ম্মদা-সলিলে নীলমণিময়। স্থানে স্থানে মর্ম্মরখণ্ড নর্ম্মদার স্রোত অবরোধ করিতে চাহিতেছে, যেন গিরি হস্তপ্রসারণ করিয়া রহিয়াছে। আবার স্থানে স্থানে এক একখণ্ড বিচ্ছিন্ন মর্ম্মর নদীগর্ভে ভাসমান। ঠিক যেন প্রকৃতি বিচিত্র বেদী নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন।

নর্ম্মদায় নৌকাবিহার—অপূর্ব্ব দৃশ্য

সাগরগামিনী নর্ম্মদা—আরব-সমুদ্রে ও নর্ম্মদায় নৌকা-বিহারের তুলনা

এই সলিলখণ্ডে বেড়াইতে বেড়াইতে আমি সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইয়াছিলাম। আমার বোধ হইল, আমি যেন একটি অপ্সরাপুরীর স্বপ্ন দেখিতেছি। সেখানে সকলই যেন সুন্দর, কোমল, তরল। সেখানে সকলই প্রেম, সহৃদয়তা এবং মহাপ্রাণতা। আমার মনে হইল, এই সলিলখণ্ড বিন্ধ্যাচলের হৃদয়। বিন্ধ্যসুতা নর্ম্মদা দুহিতা-প্রেমামৃতে ইহা পূর্ণ করিয়া, কুলু কুলু রবে কাঁদিতে কাঁদিতে পতিগৃহে চলিয়াছেন। অদূরে জলপ্রপাতের শব্দ এখান হইতে শুনিতে কি মধুর, কি করুণ! অথবা কোন সতীসাধ্বী আকুলহৃদয়ে পতিহৃদয়ে হৃদয় ঢালিতে চলিয়াছেন। সতী যে পথে যাইতেছেন, তাহার উভয় পার্শ্বস্থ সংসার-প্রস্তররাশিও যেন নির্ম্মল, পবিত্র ও সুশীতল করিয়া যাইতেছেন। বোম্বাই নগরের পার্শ্বস্থ আরব-সমুদ্রে নৌকাবিহার, সে এক দৃশ্য—তাহা মহিমাপূর্ণ,

অনন্ত প্রেমের আবাসপূর্ণ। নর্ম্মদায় নৌকাবিহার, সে অন্য দৃশ্য—তাহা মাধুর্য্যময়, ক্ষুদ্র বালিকার পিতৃপ্রেমের ক্ষুদ্র অথচ গভীর উচ্ছ্বাস। একটি বীর পতির বিরাট হৃদয়, অন্যটি বালিকা নবোঢ়া বধুর ক্ষুদ্র বুক।

প্রাণ ভরিয়া নর্ম্মদার এই মোহিনী শোভা সন্দর্শন করিয়া আসিবার সময়ে, পথে দুর্গাবতীর রাজধানী 'গড়া' এবং শৈলশেখরস্থিত তাঁহার আবাসস্থান 'মদন-মহল' দেখিয়া আসি। দুর্গাবতী পরম রূপসী গোণ্ডজাতীয়া বীরাঙ্গনা ছিলেন। তিনি স্বয়ং মোগল সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। স্বয়ং অশ্বারোহিনী হইয়া, সম্মুখ সমরে অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইয়া, ভারতবর্ষ তাঁহার কীর্ত্তিতে পূর্ণিত করিয়াছিলেন। তাঁহার দুর্গটির একটি অট্টালিকা এখনও বর্ত্তমান আছে। উচ্চ শৈলশৃঙ্গের উপর একখানি প্রকাণ্ড গোলাকৃতি পাথর। তাহার পার্শ্ব হইতে সরলভাবে প্রাচীর তুলিয়া একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। পাথরের একপার্শ্বেও একটি কক্ষ আছে। ইহা শুদ্ধ ধরিলে গৃহটি ত্রিতল। এই গৃহের দ্বিতীয়তল হইতে 'গড়া' নগরের দৃশ্য চিত্রিতবৎ সুন্দর দেখায়। পর্ব্বতটির চতুষ্পার্শ্বে স্থানে স্থানে প্রাকৃতিক গড় বা ঝিল স্ফটিকখণ্ডের মত শোভা পাইতেছে। এই সকল গড় হইতে স্থানটির নাম 'গড়া' হইয়াছে। এই গৃহটি পর্য্যন্ত এতদিন কালজয়ী হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু সেই নিরুপমা সুন্দরী, সেই দিল্লীশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বিনী বীরনারী আজ কোথায়!

রাণী দুর্গাবতী—'গড়া' নগরীর দৃশ্য

জব্বলপুরে ফিরিয়া শিল্পবিদ্যালয় দেখিতে যাই। যে সকল 'ঠগেরা' ইংরেজ সাম্রাজ্যের আরম্ভে গামছা মোড়া দিয়া সহস্র সহস্র পথিকের প্রাণহত্যা করিয়া ডাকাতি করিত, বৃটিশ শাসনের প্রভাবে আজ

তাহারা ও তাহাদের সন্তানেরা এই জব্বলপুরে আবদ্ধ থাকিয়া, অপূর্ব্ব শিল্পকার্য্য সকল করিতেছে। এই বিদ্যালয় হইতে আমাদের তাঁবু, শতরঞ্চি ইত্যাদি যাইয়া থাকে। যে হস্ত পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রাণসংহারক গামছা মুড়িত, আজ তাহা তাঁত বুনিতেছে। ইহা অপেক্ষা ইংরাজ-রাজ্যের অধিক গৌরবের কথা আর কি হইতে পারে? আজ ভারতবক্ষে যে সার্দ্ধ শত বৎসরব্যাপী অভিন্ন শান্তি আসমুদ্রগিরি বিরাজ করিতেছে, ভারতমাতা ইহা আর কখনও উপভোগ করেন নাই। ইংরাজ সাম্রাজ্যের এই শান্তি অক্ষয় হউক।

জব্বলপুর শিল্প বিদ্যালয়—ঠগী-বংশধরগণের শিল্পকার্য্য—ইংরেজরাজ্যে অক্ষুণ্ন শান্তি-প্রতিষ্ঠা



## ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনের গতি সর্ব্বতোমুখী ছিল। তিনি দেশহিতকর সকল বিষয়েই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। এরূপ সর্ব্বতোমুখী স্বদেশপ্রিয়তা প্রায় দেখা যায়না। এক সময়ে ধর্ম্মসংস্কার বিষয়ে তিনি উৎসাহী ছিলেন। তিনি এক সময়ে তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত সংযুক্ত ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার লেখকদিগের মধ্যে একজন ছিলেন। ক্রমে নানাকারণে সে সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎপরে চিরদিন জাতীয় জীবনের উন্নতির জন্য যে বিভাগে যখনই সাহায্যের প্রয়োজন হইত, তখনি সে বিষয়ে সহায়তা করিবার নিমিত্ত তিনি বদ্ধপরিকর হইতেন।

বিদ্যাসাগরের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা—দেশহিতৈষণা ও ধর্ম্মসংস্কার

তাঁহার প্রণীত "বেতাল পঞ্চবিংশতি" প্রথমে সুমিষ্ট সুললিত বাঙ্গালা রচনা-প্রণালী প্রদর্শন করিল। তৎপরে বহুদিন চলিয়া গিয়াছে, বঙ্গভাষা সে দশা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, সেই পুরাতন সংস্কৃতের ছায়াকে পরিত্যাগ করিয়া, অনেক দূর চলিয়া আসিয়াছে; কিন্তু এ বিষয়ে নূতন পথ-প্রদর্শকের মহিমা কি কখনও বিলুপ্ত হইতে পারে? তাঁহার "সীতার বনবাসের" বাঙ্গালা কি আমরা কখনও ভুলিতে পারিব? "বিধবা বিবাহ-বিষয়ক প্রস্তাবের" উপসংহার ভাগ মরণের দিন পর্য্যন্ত কি আমাদের কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইবেনা? আমাদের বর্ত্তমান বঙ্গভাষা কি পরিমাণে যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট ঋণী, তাহা কি নির্দ্দেশ করা যায়?

বিদ্যাসাগর ও বঙ্গভাষা—নূতন পথ-প্রদর্শন

একদিকে তিনি যেমন বিশুদ্ধ, কোমল, হৃদয়গ্রাহী বাঙ্গালাভাষার সৃষ্টি করিতে লাগিলেন, অপরদিকে বিদ্যালয় সকল স্থাপন করিয়া শিক্ষার

বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যখন অনুভব করিলেন যে, উচ্চশিক্ষাই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোকদের জীবিকা-অর্জ্জনের ও মনুষ্যত্বলাভের একমাত্র উপায়, তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বালকদিগের উচ্চশিক্ষার্থ নিজ ব্যয়ে নিজ বাসগ্রামে এণ্ট্রান্স স্কুল ও কলিকাতায় মেট্রপলিটান কলেজ স্থাপন করিলেন। এজন্য তাঁহাকে কত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না।

বিদ্যালয় স্থাপন ও শিক্ষাবিস্তার

একদিকে তিনি যেমন শিক্ষাবিস্তারের জন্য ব্যগ্র হইলেন, অপরদিকে দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতি বিষয়ে সহায়তা করিতে লাগিলেন। স্বর্গগত প্যারীচরণ সরকার মহাশয় যখন সুরাপান-নিবারণী সভা স্থাপন করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার একজন প্রধান সহায় ও উৎসাহদাতা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন কয়েকজন ভদ্রলোক উদ্যোগী হইয়া "হিন্দু ফ্যামিলি এনুয়িটি ফণ্ড" স্থাপন করেন, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার একজন উৎসাহদাতা ছিলেন এবং এজন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ফল কথা এই, তিনি যে কার্য্যে দেখিতেন দেশের কিছু কল্যাণ হইবার সম্ভাবনা, তাহাতেই সহায়তা করিবার জন্য অগ্রসর হইতেন, তাঁহার অর্থ ও সামর্থ্য সে কার্য্যে লাগিত।

সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধনে সহায়তা —সুরাপান নিবারণীসভা— হিন্দু ফ্যামিলি এনুয়িটি ফণ্ড

তাঁহার স্বদেশানুরাগ যেমন সর্ব্বতোমুখীন ছিল, তাঁহার বন্ধুতা, আতিথ্য, সৌজন্য—সমুদয় সেইরূপ সর্ব্বতোমুখীন ছিল। তাঁহার প্রীতি ও দয়া, জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি ধাবিত হইত। কোন কোন ইংরাজের সহিত তাঁহার এতদূর প্রীতি হইয়াছিল যে, তাঁহাদিগকে তিনি পরম মিত্র বলিয়া জানিতেন। তাঁহার ব্যবহারে

এমন একটা আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান থাকিত, এমন একটা নিজ চরিত্রের গুরুত্ব ও গৌরবের জ্ঞান প্রকাশ পাইত যে, তাঁহারা তাঁহাকে সমুচিত শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারিতেননা। তাঁহারা দেখিতেন, বিদ্যাসাগর নিঃস্বার্থ পুরুষ, স্বার্থসাধনের মানসে তাঁহাদের দ্বারস্থ হননা, পরার্থের জন্যই তাঁহাদের সাহায্য চান, সুতরাং তাঁহারা তাঁহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারিতেননা। দুটি জিনিসকে ইংরাজেরা বড়ই ঘৃণা করেন, প্রথমতঃ স্বার্থসাধনার্থ বন্ধুতা, দ্বিতীয় 'না' বলিবার সাহসের অভাব। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্রে উক্ত উভয় দোষের কোনটিই ছিলনা। তাঁহার মত নিঃস্বার্থ প্রকৃতির পুরুষ অতি অল্পই দেখা গিয়াছে। তিনি সততই 'না' কথাটা বলিতে সাহসী হইতেন। এজন্য ইংরাজগণ তাঁহাকে সমুচিত শ্রদ্ধা করিতেন ও তাঁহার সহিত তদনুরূপ ব্যবহার করিতেন। তাঁহাদের সহিত মিশিবার সময়ে তিনি পূর্ণমাত্রায় আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া চলিতেন।

বন্ধুতা, আতিথ্য, সৌজন্য প্রীতি, দয়া—প্রবল আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান ও নিঃস্বার্থপরতা—ইংরাজদিগের শ্রদ্ধালাভ

যে গুণের জন্য তিনি দেশের লোকের নিকটে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাহা তাঁহার ভুবনবিখ্যাত দয়া। এ বিষয়ের অসংখ্য গল্প দেশে প্রচলিত আছে। তাঁহার দয়া যে কিরূপ জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলকেই আলিঙ্গন করিত, তাহার একটিমাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব। একবার মান্দ্রাজ প্রদেশের দুইটি ভদ্র ঘরের ছেলে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার আশায় বোম্বাই সহরে যায়। সেখান হইতে খ্রীষ্টীয় মিশনারিগণ তাহাদিগকে কলিকাতায় আনয়ন করেন। কলিকাতায় আসিয়া তাহাদের মত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এদিকে তাহারা জাতিভ্রষ্ট, স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে চাহিলেও হঠাৎ যাইতে পারেনা। খৃষ্টীয়

বিদ্যাসাগরের দয়া—দয়ার দৃষ্টান্ত

মিশনারিগণ ও তাঁহাদের বৃত্তি বন্ধ করিয়া দিলেন। তখন তাহারা নিরুপায় হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন সভার অধিবেশনের দিন সেখানে গিয়া কলিকাতার দলপতি বাবুদিগকে ধরিল। তাঁহারা কেহ দুই টাকা, কেহ এক টাকা, এইরূপে কয়েক টাকা চাঁদা স্বাক্ষর করিলেন। দুই জনের অভাবপক্ষে চৌদ্দ পনর টাকা চাই, তাহার মধ্যে আট দশ টাকা স্বাক্ষরিত হইল। যাহা স্বাক্ষরিত হইল, তাহাও আদায় হয়না; এক এক স্থানে দুই চারিবার যাইতে যাইতে তাহাদের সমুদয় সময় যাইতে লাগিল, পড়াশুনা একপ্রকার বন্ধ হইয়া গেল। এই অবস্থায় তাহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারে উপস্থিত হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাদিগকে দেখিয়া ও তাহাদিগের সহিত কথা কহিয়াই জানিতে পারিলেন যে, তাহারা ভদ্রঘরের সন্তান। তৎপরে যখন শুনিলেন যে, দশটি টাকা স্বাক্ষর করাইয়া তাহারা প্রায় একমাসকাল দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছে, তখন ক্ষোভে ও ক্রোধে পূর্ণ হইয়া তাহাদের চাঁদার বহিখানি ছিঁড়িয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন—"তোমরা গিয়া পড়াশুনা কর, প্রতিমাসের ২রা কি ৩রা তোমাদের জন্য ১৪টি টাকা ও দুই জোড়া কাপড় তোমাদের বাসাতে যাইবে।" তাহারা যতদিন এখানে ছিল, ততদিন এই মাসিক ১৪টি টাকা ও দুইজোড়া কাপড় তাহাদের জন্য আসিত। সর্ব্ব বিষয়েই তাঁহার হৃদয় কি প্রশস্ত ও উদার ছিল!

বিদ্যাসাগরের অকৃত্রিমতা

সর্ব্বশেষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটি প্রধান গুণের উল্লেখ করিতেছি, সেটি তাঁহার অকৃত্রিমতা। এমন স্পৃহণীয় অকৃত্রিমতা আর কোথাও দেখিবনা। প্রকৃতির হাতে গড়া এমন আভাঙ্গা মানুষটি প্রায় পাওয়া যায়না। কৃত্রিমতা কাহাকে বলে তিনি জানিতেননা। তোমরা দশজনে তাঁহাকে

কি দেখিবে ও বলিবে তাহা তাঁহার মনেই হইতনা। তিনি গিরিপৃষ্ঠজাত, অযত্নসম্ভূত, প্রকাণ্ড ওক বৃক্ষের ন্যায় শৈবালরাশিতে আকীর্ণ হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই স্বভাবজাত বন্ধুরতার মধ্যেও একপ্রকার গাম্ভীর্য্য-সম্বলিত মনোহারিত্ব ছিল। এই জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ভালবাসিতাম যে, তাঁহাতে তাজা, খাঁটি ষোল-আনা মানুষটি পাইতাম।

বিদ্যাসাগরের সতেজ মনোবৃত্তি

তাঁহার সকল বৃত্তিই সতেজ ও উৎকট ছিল; ভালবাসাও উৎকট, বিদ্বেষও উৎকট। বিদ্যাসাগর মহাশয় যাহাকে ভালবাসিতেন, প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। তাঁহার বন্ধুতা, বাৎসল্য, দয়া—সমুদয় সতেজ ছিল।

অপূর্ব্ব বন্ধুপ্রেম

এমন প্রেমিক বন্ধু বঙ্গদেশে কেহ কখন দেখিয়াছেন কিনা জানিনা। রামতনু লাহিড়ী, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ দে, কালীকৃষ্ণ মিত্র, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী প্রভৃতি তাঁহার হৃদয়ের প্রিয় যে সকল বন্ধু ছিলেন, তাঁহাদের প্রতি তাঁহার যে অবিচলিত প্রেম দেখিয়াছি, ভাষাতে তাহার বর্ণনা হয়না। বন্ধুগণকে ভালবাসিয়া, উপহার দিয়া, খাওয়াইয়া, তাঁহার কখনই তৃপ্তি হইত না। তাঁহার বন্ধুগণ পরলোকগত হইলেও তাঁহার প্রেম তাঁহাদের পরিবার পরিজনকে আলিঙ্গন করিয়া থাকিত। ইহার একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। তাঁহার একজন প্রিয়বন্ধু পরলোকগত হইলে, তিনি তাঁহার পরিবার পরিজনকে আপনার জ্ঞান করিতেন। একবার তিনি শুনিলেন যে, তাঁহার বন্ধুর কন্যা উন্মাদরোগগ্রস্তা হইয়া এই খেয়াল ধরিয়াছেন যে, বিদ্যাসাগর খাওয়াইয়া না দিলে খাইবনা; সেইজন্য তিনি অনাহারে আছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই কথা শুনিয়া তাঁহার বিবিধ কাজের মধ্যে সময় করিয়া, ঐ বন্ধুর কন্যাকে দুই

বেলা খাওয়াইতে যাইতেন। এরূপ অনেক দিন করিতে হইয়াছিল। সকল বিষয়েই এইরূপ। এমন মাতৃভক্ত কে কবে দেখিয়াছে? তাঁহার আরাধ্যা জননী দেবীর স্বর্গারোহণ হইলে, নিকটের লোকে প্রায় দুই তিন বৎসরকাল সতর্ক থাকিতেন; তাঁহার সহিত কথোপকথনে তাঁহার জননীর উল্লেখ করিতেন না; কারণ তাহা হইলে তিনি বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতেন।

অপূর্ব্ব মাতৃভক্তি

তাঁহার প্রেম যেমন তেজস্বী ছিল, বিদ্বেষও তেমনই তেজস্বী ছিল। যাহার স্বভাব চরিত্র দেখিয়া একবার চটিতেন, তাহার নাম আর শুনিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহার এই আশ্চর্য্য মহত্ত্ব ছিল যে, বিপদে পড়িলে সেই সকল ব্যক্তির সাহায্য করিতে ত্রুটি করিতেননা।

বিদ্যাসাগরের প্রেম ও বিদ্বেষ—আশ্চর্য্য মহত্ত্ব

ঋষি ঠিক কথা বলিয়াছেন, মননের দ্বারা যে জীবিত থাকে, সেই প্রকৃতভাবে জীবিত। জীবনের ধনধান্য লইয়া জীবন নহে, কে কত উপার্জ্জন করে, কে কত সঞ্চয় করে, তাহা লইয়া জীবনের বিশালতা ও বিস্তৃতি নহে; কিন্তু কে কি চিন্তা করে, কে কি আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে ধারণ করে, কে কি আদর্শ অনুসারে চলে, তাহা লইয়াই জীবনের বিচার। দৈহিক জীবনের ঘটনা সকল আজ আসে, কাল চলিয়া যায়; সুখ বা দুঃখ চিরদিন থাকে না; সম্পদ বিপদের মুখ সকলকেই দেখিতে হয়। বঙ্গের প্রিয় কবি মধুসূদন বলিয়াছেন;

মননমূলক জীবন—জীবনের বিচার

অবস্থার পরিবর্ত্তন—চরিত্র

"চিরস্থির কবে নীর হায়রে জীবন নদে!"

জীবন নদীর নীর স্থির থাকে না; কত অবস্থাই আসিতেছে, কত অবস্থাই যাইতেছে; কিন্তু সুখ-দুঃখ, সম্পদ-বিপদ, ঘটনা, অবস্থা কিছুই

বৃথা আসে যায়না। কিছু রাখিয়া যায়, কিছু গড়িয়া যায়, কিছু লইয়া, কিছু দিয়া যায়। লইয়া যায় জীবনের শক্তি, দিয়া যায় চরিত্র। মানুষ এ জগতে ভাবিয়া, চিন্তিয়া, হাসিয়া, কাঁদিয়া, উঠিয়া, পড়িয়া, খাটিয়া একটা কিছু হইয়া দাঁড়াইতেছে, সেটা তার চরিত্র। এই চরিত্র-পদার্থ যাঁহাদের সাধনার বিষয় হয়, তাঁহারা মনন রাজ্যেই বাস করেন এবং দেহ-রাজ্যকে সামান্য জ্ঞানে উপেক্ষা করিয়া থাকেন।

এই জন্যই বিদ্যাসাগর মহাশয় এক হস্তে যেমন হাজার হাজার টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তেমনি আর এক হস্তে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি উপস্থিত মত ধনাগমের একটা উপায় করিতেন; কিন্তু আপনার চরিত্রকে সর্ব্বপ্রযত্নে বাঁচাইতেন। থাক্ ধর্ম্ম, যাক্ পদ, থাক্ ধর্ম্ম, যাক্ অর্থ, থাক্ ধর্ম্ম, যাক্ বন্ধুতা, এই কথা সর্ব্বদাই বলিতেন। ইহা বলিতে না পারিলে এজগতে চরিত্রবান্ হওয়া যায়না। ঝড় উঠিলে কৃপণ আপনার বাক্সটি লইয়া পলায়, জননী আপনার শিশুটিকে লইয়া পলায়, যেটি যার প্রিয় তাহাকেই সে বাঁচাইবার চেষ্টা করে; বিদ্যাসাগরের মত ব্যক্তি বিপদের ঝড়ে সর্ব্বাগ্রে আপনার চরিত্র বাঁচাইবার চেষ্টা করেন, ধর্ম্মকে বাঁচাইয়া পলান, কারণ ধর্ম্মই তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। এইরূপ চরিত্রবান্ ব্যক্তিগণ যে দেশে উত্থিত হন, সে দেশ ত্বরায় মহত্ত্ব ও গৌরবের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঈশ্বর করুন, আমাদের দেশ সেই গৌরব-পদবীতে উন্নীত হউক।

বিদ্যাসাগরের চরিত্র রক্ষা



# উপাসনা।

মোগল সম্রাট্ আকবর কর্ত্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পর সতীশচন্দ্র নামক এক ব্রাহ্মণ-বংশীয় সুচতুর, পাঠান-কর্ম্মচারী, মোগল সেনাপতি রাজা টোডরমল্লের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং স্বীয় কর্ম্মদক্ষতায় তাঁহার প্রীতিসাধনপূর্ব্বক কালক্রমে বিপুল ধনসম্পত্তি ও বঙ্গদেশের দেওয়ানী পদের অধিকারী হন। একদা তাঁহার স্নেহপালিতা কন্যা বিমলা, পিতৃকল্যাণকামনায় দেবারাধনার জন্য ইচ্ছামতী নদী-তীরস্থ সুপ্রসিদ্ধ মহেশ্বর মন্দিরে গমন করেন। বর্ত্তমান আখ্যায়িকার এই পিতৃগতপ্রাণা তরুণীর দেবোপাসনার কথা সতেজ, সুললিত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।]

চন্দ্রোদয় হইয়াছে, সম্মুখে উচ্চ মহেশ্বর মন্দির চন্দ্রালোকে অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া গভীর নীল আকাশপটে যেন চিত্রের ন্যায় ন্যস্ত রহিয়াছে। চারিদিকে উজ্জ্বল, শ্বেত সৌধমালা চন্দ্রকিরণে রৌপ্যমণ্ডিতের ন্যায় শোভা পাইতেছে, সেই সৌধমালা হইতে অসংখ্য প্রদীপালোক বহির্গত হইয়া নয়নপথে পতিত হইতেছে। মধ্যস্থ প্রশান্ত ভূমিখণ্ড প্রায় জনশূন্য হইয়াছে, যে স্থানে সমস্ত দিন কলরব হইতেছিল, এক্ষণে সেই স্থান প্রায় নিস্তব্ধ হইয়াছে। স্থানে স্থানে বৃক্ষপত্রের মধ্যে পুঞ্জ পুঞ্জ খদ্যোতমালা নয়ন-রঞ্জন করিতেছে। শীতল সুগন্ধ সমীরণ রহিয়া রহিয়া বহিতেছে ও নিকটস্থ উচ্চ বৃক্ষ হইতে সুমধুর গম্ভীর রব বাহির করিতেছে। সেই রব ভিন্ন অন্য রব নাই; কেবল স্থানে স্থানে পেচকের শব্দ শুনা যাইতেছে; কেবল কখন কখন দূরস্থ ক্ষেত্র হইতে দুই একটা গাভীর হাম্বারব শুনা যাইতেছে; কেবল দূরস্থ গ্রামবাসীদিগের গীত গান বায়ুপথে আরোহণ করিয়া কখন কখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে। সে সময়ে, সে স্থানে, সেই গীত শুনিলে বড় সুললিত বোধ হয়।

চন্দ্রালোকে মহেশ্বর-মন্দির—চারিদিকের দৃশ্য ও ধ্বনি-বৈচিত্র্য

এই নিস্তব্ধ শান্তপথে যাইতে যাইতে বিমলার হৃদয়ও কিছু শান্ত হইল; চিন্তা কিঞ্চিৎ পরিমাণে দূর হইতে লাগিল, প্রকৃতির নিস্তব্ধতা দেখিয়া বিমলার হৃদয়েও শান্তভাবের আবির্ভাব হইতে লাগিল। সেই দেবায়তনে প্রাতঃকালে দুই একটি করিয়া লোক সমবেত হয়; মধ্যাহ্নে কোলাহলের সীমা থাকে না; সায়ংকালে সেই কলরব ক্রমে হ্রাস হইয়া আইসে; রজনীতে সমস্ত নির্জ্জন, নিস্তব্ধ, শান্ত! বিমলা বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আমাদের জীবনেও এইরূপ। শৈশবে মনের প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে চলিতে থাকে, যৌবনে সেই প্রবৃত্তি সমূহের দুর্দ্দান্ত প্রতাপ—যেন জগৎ সংসারকে গ্রাস করিবে; বার্দ্ধক্যে ক্রমে নিস্তেজ হইয়া আইসে; শীঘ্রই শান্ত, নিস্তব্ধ, অনন্ত সাগরে লীন হইয়া যায়। তবে এত ধূমধাম কেন?—এত দর্প, এত গর্ব্ব, এত কৌশল, এত মন্ত্রণা কেন?—এত ক্রোধ, এত লোভ, এত অর্থলালসা, এত উচ্চাভিলাষ কেন? বিধির নির্ব্বন্ধ কে বুঝিবে? যে পতঙ্গ মুহূর্ত্ত মধ্যে ভস্মসাৎ হইবে, তাহার পক্ষ বিস্তার করিয়া আকাশের দিকে ধাবমান হওয়া কেন? যে শিশির-বিন্দু মুহূর্ত্তে মনুষ্যপদে দলিত হইবে বা প্রাতঃকালের রবি-কিরণস্পর্শে শুকাইয়া যাইবে, তাহার হীরকখণ্ডের জ্যোতিঃবিস্তার কেন?

বিমলার মানসিক শান্তি—নৈশ-নিস্তব্ধতা—মানব-জীবনের সহিত তুলনা

এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে বিমলা সহসা রজনী দ্বিপ্রহরের ঘণ্টারব শুনিতে পাইলেন। সেই ঘণ্টারব চতুর্দ্দিকস্থ সৌধমালায় প্রতিহত হইয়া, দশগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বায়ুমার্গে সঞ্চরণ করিতে লাগিল—নিস্তব্ধ নৈশগগনে আরোহণ করিয়া সঞ্চরণ করিতে লাগিল। ঘণ্টারব শেষ হইতে না হইতে দ্বিপ্রহরের পূজা আরম্ভ হইল। সপ্তস্বরে

নিশীথে আরতি ও দেবারাধনা—দেব-মহিমাগীতি

মিলিত হইয়া মহেশ্বরের অনন্ত মহিমা গীত হইতে লাগিল, কাদম্বিনীর গম্ভীর নির্ঘোষবৎ সেই গীত কখন মন্দীভূত, কখন সতেজে উচ্চারিত হইতে লাগিল; উপাসকদিগের মন দ্রবীভূত হইতে লাগিল। বিমলা সপ্তস্বরে সেই গানের সহিত যোগ দিলেন, তাঁহার হৃদয় পবিত্র প্রেমে ও উল্লাসে প্লাবিত হইতে লাগিল।

বিমলা যখন মন্দিরের ভিতর আসিয়া পৌছিলেন, তখন আর অধিক উপাসক ছিলনা, প্রায় সকলেই চলিয়া গিয়াছিল। বিমলা পূজায় রত হইলেন।

বিমলার পূজারম্ভ

প্রায় এক প্রহর কাল মুদিত নয়নে নিস্পন্দ শরীরে বিমলা পূজা করিতে লাগিলেন। হৃদয়ে যে পবিত্র কামনার উদয় হইতেছিল, বিমলার বদনমণ্ডলে তদনুরূপ পবিত্রভাব অঙ্কিত হইতে লাগিল। বিমলার মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্বামী, বন্ধু কেহ নাই; পিতাই একমাত্র ভক্তির আধার, পিতাই স্নেহের পাত্র, পিতাই পরম বন্ধু, পিতাই পূজনীয় দেবতা। বিমলার অপার স্নেহস্রোত, অপরিসীম ভক্তিস্রোত, সেই একমাত্র আধারাভিমুখে ধাবমান হইল। পিতার দুঃখেই দুঃখ, পিতার আনন্দেই আনন্দ, পিতার বিপদে চিন্তা, পিতার সম্পদে ভরসা, বিমলা পিতার জীবনেই জীবন ধারণ করিতেন। সেই পিতার মঙ্গলার্থ প্রার্থনা করিতে করিতে বিমলার হৃদয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল; হৃদয়ের নিভৃত কন্দর পর্য্যন্ত ভক্তিরসে প্লাবিত হইল। অর্দ্ধপ্রহর কাল বিমলা উপাসনা করিলেন। উপাসনান্তে যখন বিমলা প্রণিপাত করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, তখন তাঁহার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে চিন্তাশূন্য ও শান্ত।

বিমলার উপাসনা—জীবনের একমাত্র অবলম্বন পিতার কল্যাণের জন্য ঐকান্তিক প্রার্থনা—ভক্তিরসের উচ্ছ্বাস—উপাসনান্তে শান্তি ও চিন্তা-শূন্যতা

---

# ভীষ্মদেব।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞোপলক্ষে যখন ভারতের রাজেন্দ্র ও বীরেন্দ্রবর্গ এক মহাসভায় সমবেত হন, অমিতপরাক্রান্ত যোদ্ধৃবর্গের সগর্ব্ব পাদক্ষেপে যখন বসুধা কম্পিত হইয়া উঠে, সুদূরদর্শী দেবর্ষি নারদ তখন বেদব্যাসকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "এই যে তরঙ্গায়িত মহার্ণবের ন্যায় ভারতের সমগ্র বীরত্ব সম্মুখে মূর্ত্তিমান দেখিতেছ, অতিঅল্পকালমধ্যে কুরুক্ষেত্রে এক ভীষণ সংগ্রাম হইয়া এ সমস্ত বিনাশপ্রাপ্ত হইবে, সেই কাল-সমরে ভারতের ভাগ্যলক্ষ্মী ও পরাক্রম একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে।" ধার্ম্মিকবর ব্যাসদেব তখন একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক আপন হৃদয়ের কঠোর শোকভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। আজি সহস্র সহস্র বৎসর পরে ভীষ্মচরিত বর্ণনা করিতে সেই শোচনীয় বাক্যগুলি এবং সেই মর্ম্মস্পর্শী দীর্ঘ নিশ্বাস স্বজনাদিবিরহিত সর্ব্বস্বান্ত হতভাগ্যের পূর্ব্বস্মৃতির ন্যায় হৃদয়ে জাগরিত হয়।

দেবর্ষি নারদের ভবিষ্যদ্বাণী—ব্যাসদেবের শোকভাব

আতসবাজির অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ ভারতের বীর্য্য ও পরাক্রম কুরুপাণ্ডবের ভীষণ আহবে অনন্ত আকাশে মিশিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার রঙ্গভূমি কুরুক্ষেত্র পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া এখনও এ দেশে অতি গৌরবের বস্তু; অন্যান্য মহাতীর্থের ন্যায় বীরত্বের সমাধিমন্দির কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশান এক মহাতীর্থস্থান। যে ভূমিতে প্রথমতঃ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী গজাশ্ব-রথসম্বলিত হইয়া যুঝিয়াছিল, যে স্থানে অমানিশার তমসাচ্ছন্ন ঘনাবৃত আকাশের শেষ নক্ষত্রের ন্যায় পৃথ্বীরাজ আপন জীবনের সহিত সমগ্র ভারতবর্ষ মুসলমানের হস্তে সম্প্রদান করেন, যে স্থলে পাঠানবংশীয় ইব্রাহিম লোদী মোগল-রণে পরাভূত হন, যেখানে আকবর সাহ হিমুকে পরাস্ত

করিয়া আপন প্রভুত্ব বিস্তার করেন, যে স্থলে হতভাগ্য হিন্দুদিগের বৈজয়ন্তী আমেদ সাহ কর্ত্তৃক বিলুণ্ঠিত হয়, আর যাহার অনতিদূরে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে রাজস্থূয়ের মহাসভায় ইংলণ্ডেশ্বরী রাজরাজেশ্বরী উপাধি গ্রহণ করিয়া ভারতে আপন রাজশ্রীর গৌরব বিস্তার করিয়াছেন,

কুরুক্ষেত্রের স্থানমাহাত্ম্য—ভীষ্মদেবের বীরত্ব ও চরিত্র

সেই শত থার্ম্মপলিসমতুল্য, মহাবিস্তৃত, মহাক্ষেত্রের প্রথমাভিনয়ে দুর্ব্বার-পরাক্রম ভীষ্ম সর্ব্বপ্রধান বীর ছিলেন। কবি, পার্থকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিতে এবং তাঁহাকে সর্ব্বোজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিতে যত কেন চেষ্টা না করুন, তাঁহার সকল চেষ্টা উপেক্ষা করিয়া তাঁহারই লেখনীতে শান্তনুতনয়ের চরিত্র সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। কুরুক্ষেত্রই ভীষ্ম, ভীষ্মই কুরুক্ষেত্র এবং ভারতের মূর্ত্তিমান বীরধর্ম্ম।

রাজ্যলোলুপ বীরগণ স্বজনাদির সর্ব্বনাশ সাধনপূর্ব্বক শোণিতসিক্ত পদে সিংহাসন কলঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু উদার প্রকৃতি ভীষ্ম, করপ্রাপ্ত বিপুল সাম্রাজ্য তুচ্ছ লোষ্ট্রখণ্ডের ন্যায় ফেলিয়া দিয়াছেন। যখন দেখিলেন, মহারাজ শান্তনু সত্যবতীর পাণিগ্রহণ করিতে পারেননা, পিতার সন্তোষসাধনার্থ ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করিলেন, জীবনের মধ্যে একদিনও রাজ্যলালসা করিবেননা, সত্যবতীর গর্ভজ সন্তান রাজা হইলে অণুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হইবেননা। ভীষ্ম এই অশ্রুতপূর্ব্ব স্বার্থোৎসর্গে মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াই বিরত হন নাই, তাঁহার প্রশান্ত হৃদয়ে ক্ষণেকের জন্যও যে তজ্জন্য অনুতাপ হয় নাই, ঈর্ষা, দ্বেষ, অসন্তোষ, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি নীচ-প্রকৃতি-সুলভ দোষসমূহে মুহূর্ত্তজন্যও যে সেই অনাবিল হৃদয়-সরসী কলঙ্কিত হয় নাই, কার্য্যতঃ তাহা উত্তমরূপে দেখাইয়াছেন। তিনি কাশীরাজতনয়াগণের স্বয়ম্বর-সভাসীন নৃপতিবর্গকে পরাস্ত করিয়া

ভীষ্মের অপূর্ব্ব মহত্ত্ব ও স্বার্থত্যাগ

ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের সহিত দুই কন্যার বিবাহ দিলেন। বৈমাত্রেয়দ্বয় অল্পকালমধ্যে কালসদনে গমন করিল; তখনও ভীষ্ম-হৃদয়ে রাজ্য-লালসার উদয় হইলনা, ভ্রাতুষ্পুত্রগণের জন্য রাজ্য রক্ষিত হইল।

ভীষ্মচরিত্রে রাজনীতিজ্ঞের স্বভাবসিদ্ধ স্বার্থপরতার অভাব

যাঁহারা রাজনীতির কূট প্রশ্নসকল নিয়ত আন্দোলনে জীবন অতিবাহিত করেন, তাঁহাদের যত কেন বীরত্ব থাকুকনা, হৃদয় যত কেন প্রশান্ত হউকনা, স্বার্থচিন্তায় তাঁহাদের সকলেরই অন্তঃকরণ অতি অল্প দিনে সঙ্কুচিত ও কুটিল হইয়া পড়ে, কিন্তু মহারথী ভীষ্ম সেই সার্ব্বভৌম নিয়মের অন্তর্ভূত ছিলেননা। তিনি রাজনীতি-শাস্ত্রে বিলক্ষণ প্রাজ্ঞ ছিলেন, তাঁহার উপদেশানুসারে সম্পাদিত যুধিষ্ঠিরের রাজ্যশাসন প্রসিদ্ধ আছে।

ভীষ্ম ও বাসুদেব

রাজনীতির সূক্ষ্মতত্ত্বদর্শী বাসুদেব ভীষ্মকে বিলক্ষণ জানিতেন, ভীষ্মও বাসুদেবকে যার পর নাই ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন; সুতরাং যুদ্ধ-কুশল বীরদ্বয় দ্বন্দ্বযুদ্ধে যেমন একে অন্যের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া প্রত্যাক্রমণজন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকে, তাঁহাদের সেরূপ থাকিতে হয় নাই। দৈবকেয় আপনার অসাধারণ বুদ্ধিচক্রে সমস্ত ভারতবর্ষ আবর্ত্তন করিতেন, কিন্তু ভীষ্মের জ্ঞান-গৌরব এবং অলৌকিক শৌর্য্যের নিকট সেই চক্রের অবিরাম গতিও থামিয়া যাইত। যে কালযুদ্ধে চেদীশ্বর মহারাজ শিশুপাল কৃষ্ণের হস্তে নিহত হন, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে ভীষ্মদেব অসামান্য ধীরতা ও সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনপূর্ব্বক যে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা বাসুদেবের শ্রেষ্ঠত্ব ও শিশুপালের অন্যায় প্রদর্শন করেন, যিনি একবার সাবধানে তাহা পাঠ করিবেন, তিনিই ভীষ্মের জ্ঞান-গাম্ভীর্য্য ও বাগ্মিতায় মোহিত হইবেন।

বিরাটরাজ্যে অবস্থিতিসময়ে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন যখন এক রথে দুর্য্যোধন ও তাঁহার সঙ্গীয় যোদ্ধৃগণকে পরাভূত করেন, মহাভাগ ভীষ্ম তখন পাণ্ডবগণকে দেখিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। ধনঞ্জয়কে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ের কোমলভাব একেবারে উথলিয়া উঠিল।

ভীষ্মের স্নেহপরায়ণতা

হিমাচলের পাদদেশে প্রসন্নসলিলা জাহ্নবীর ন্যায় পাষাণতুল্য বীরের স্নেহ উচ্ছ্বসিত ও প্রবাহিত হইল। সব্যসাচী আর্দ্র হইলেন। তিনি দেখিলেন, পিতামহের কাচস্বচ্ছ হৃদয়াকাশ কোটি নক্ষত্রসজ্জিত, পবিত্র ও নির্ম্মল। বুঝিলেন, সে আকাশ ক্ষণমাত্রও মেঘাবৃত থাকেনা; রণক্ষেত্রের ভীষণ গর্জ্জন ভিন্ন তাহা হইতে অশনি-নিনাদও শ্রুত হয়না; তথাপি স্নেহাধারগণের পিপাসার্ত্ত হৃদয় শীতল করিতে সর্ব্বদাই পবিত্র বারিবর্ষণ করিতে পারে।

কবি, ভীষ্মচরিত্র বর্ণন করিতে শুভক্ষণে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি ইহাতে সম্যক্ কৃতকার্য্য হইয়াছেন। যেমন জগৎ-দুর্লভ চরিত্র,

ভীষ্মের অতুলনীয় চরিত্র—ব্যাসদেবের বর্ণনা-নৈপুণ্য—ভীষ্মচরিত্রে কোমলতা ও কঠোরতার অপূর্ব্ব সমাবেশ

তেমনি অতুল বর্ণনা,—উভয়ে উভয়ের প্রতিযোগী হইয়াই যেন চরমোৎকর্ষ দেখাইয়াছে। পৃথিবীর কোন কবি, কোন পুরাবৃত্তলেখক, কোন চিত্র-কর এরূপ চিত্র প্রদান করিতে পারেন নাই। ব্যাসদেবের লেখনীতে ভয়ঙ্কর ও মনোহরের আশ্চর্য্য সমাবেশস্থল ভীষ্মচরিত্র এরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, সেই বিশাল সমুদ্রের যুগপৎ অশনি ও অমৃত-উৎপাদনশক্তিতে আর কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারেনা। একবার, দাম্পত্য-প্রণয়ের কুসুম-কোমলতা নাই দেখিয়া যে হৃদয় মরুভূমির ন্যায় নীরস বোধ হয়, শত্রুর শোণিতস্রোতে রঙ্গভূমি কর্দ্দমিত করিতে দেখিয়া যাহা নিতান্ত নির্ম্মম বলিয়া অন্তঃকরণে ধারণা হইতে পারে, আবার পরক্ষণে আশ্রিত, বিপন্ন, রুগ্ন, স্নেহাধারগণের

প্রতি সেই হৃদয় হইতে দয়ার স্রোত মন্দাকিনীর স্রোতের ন্যায় পবিত্র, নির্ম্মল ও অবিরামগতিতে প্রবাহিত দেখিয়া মনের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

ভীষ্মের উপদেশবাণী—ভীষ্মচরিত্রের সর্ব্বাঙ্গীন শ্রেষ্ঠতা

শান্তিরসপূর্ণ শান্তনুনন্দনের কণ্ঠ-নিঃসৃত মধুর উপদেশগুলিতে শ্যামল শস্যক্ষেত্রের নয়নতৃপ্তিকর সৌন্দর্য্য ও বসন্তের কুসুম-সুষমা বা নিদাঘের পবন-মাধুর্য্য প্রভৃতির ন্যায় তৃপ্তি ও সন্তোষ যুগপৎ উৎপাদন করে। ভীষ্মচরিত্র অঙ্কিত করিতে ব্যাসদেবের ন্যায় কবিও সঙ্কুচিত হইয়াছেন। কিন্তু পরিশেষে যে উপায় অবলম্বনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা অতিশয় প্রশংসনীয়। প্রথমতঃ দেবোপম কয়েকটি চরিত্র অঙ্কনপূর্ব্বক কাহারও উপর একটি রেখাপাত, কোনটির উপর কিঞ্চিৎ কালিমানিক্ষেপ করিয়া সকলকেই ভীষ্মের ছায়ায় ফেলিয়াছেন। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ" বলিলেন, পঞ্চপুত্রসহ নিষাদিনীকে দগ্ধ করিতে অনুমতি দিলেন; সুতরাং তাঁহার চরিত্র ভীষ্মের ছায়ায় পড়িয়া গেল। প্রবলপ্রতাপ ভীমসেন সারল্য প্রভৃতি গুণনিচয়ে অতুল্য, তিনি যথার্থ ক্ষত্রিয়, তাঁহার চরিত্র কবি এবং পাঠক-পাঠিকাগণের অতি প্রিয়। যখন বিপক্ষপ্রযুক্ত অমোঘ প্রহরণ অগ্নিতেজে ধাবিত হইল, সেই অমোঘাস্ত্র ভীষণরবে দশদিক্ পূর্ণ করিল; কেহই নিবারণ করিতে সমর্থ হইলনা; বাসুদেবের পরামর্শে অর্জ্জুনাদি বীরগণ একে একে সকলেই শত্রুকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন; ভীমসেন তখনও ক্ষত্রিয়, তখনও অটল। কৃষ্ণ তাঁহাকে আপন শরীর দ্বারা আবরণপূর্ব্বক রক্ষা করিলেন। সেই ভীমসেনও বুদ্ধি প্রভৃতি মানসিক গুণনিচয়ে ভীষ্মের ছায়ায় রহিয়াছেন। শারীরিক শক্তিতেও ভীষ্ম ভীম হইতে ভীষণতর। যিনি একাকী সুরলোকে অসুরনাশে বামনের সাহায্য

করিয়াছিলেন, কিরাতরূপী পশুপতিকে যুদ্ধদানে* সন্তুষ্ট করিয়া পাশুপত নামক মহাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যাঁহার অব্যর্থ প্রতাপে খাণ্ডববন দগ্ধ হয়, কৌরবগণ পরাস্ত হয়, যিনি একাকী ভীষ্মকে যুদ্ধদানে সমর্থ ছিলেন, সেই পার্থও একবার শত্রুকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন, তাঁহার সকল চেষ্টা ভীষ্মের নিকট ব্যর্থ হইয়া যায়।

দেবসেনাপতি স্কন্দের ন্যায় মহাবাহু ভীষ্মও সমরশাস্ত্রে অদ্বিতীয়। কার্ত্তিকেয় যেমন অসুরনাশে পরাক্রম-প্রদর্শনপূর্ব্বক দেবলোকে প্রসিদ্ধ, ভীষ্মও সেইরূপ নরলোকে প্রতাপ-প্রদর্শনে বিখ্যাত। সত্য ও প্রতিজ্ঞাপালন তাঁহার প্রধান ধর্ম্ম ছিল, সেই গুণেই তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। "ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা" এই শব্দটি উচ্চারিত হইবামাত্র শরীর রোমাঞ্চিত হয়, তৎক্ষণাৎ মনে হয়, ইহা অব্যর্থ। শাস্ত্রপ্রণেতা মনু যুদ্ধবিষয়ে যে সনাতন নিয়মগুলি লিখিয়াছেন, ভীষ্ম ব্যতীত আর কোথাও সেই সমস্ত অবিকল পালিত হইতে দেখা যায়না। তিনি অমঙ্গল দেখিলেই যুদ্ধ করিতেননা। যে ব্যক্তি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিত, যে রুগ্ন, অথবা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হয় নাই, যে নিরস্ত্র, ক্লীব বা বিকলাঙ্গ, আপনি রথারোহী থাকার সময় যে ব্যক্তি মৃত্তিকায় দণ্ডায়মান, যে ব্যক্তি শয়ান, শরণাগত, ভীত বা পলায়িত, যাহার অল্পশক্তি, যাহাতে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম নাই, এইরূপ কাহাকেও আক্রমণ করিতেননা। আপন পরাক্রমে বিশ্বাস থাকাতে সিংহ যেমন শিকারে মহত্ত্ব প্রদর্শন করে, বীরেন্দ্রকেশরী ভীষ্মও সেইরূপ সমরে আপনি আপনাকে জানিতেন বলিয়া সর্ব্বদাই মহত্ত্ব দেখাইয়াছেন। তিনি কখনও অন্যায় যুদ্ধ করেন নাই, কূটযুদ্ধপ্রিয় দুর্য্যোধন ও তাঁহার পক্ষীয় যোদ্ধৃবর্গের প্রতি তাঁহার যে আন্তরিক অশ্রদ্ধা ছিল এবং তিনি যে পাণ্ডবগণের হিতকামনা

ভীষ্মের বীরত্ব—সত্য ও প্রতিজ্ঞাপালন—সমর-নীতির যথাযথ অনুসরণ—ভীষ্মের মহত্ত্ব—অন্যায় ও অধর্ম্মাচরণের প্রতি ঘৃণা।

করিতেন, এই অধর্ম্মাচরণের প্রতি ঘৃণাই তাহার একমাত্র কারণ। যে নৃশংস যুদ্ধে দ্রোণ-কর্ণাদি সপ্তরথী বালক অভিমন্যুকে বেষ্টন করিলেন, অর্জ্জুন-তনয়, সিংহের ন্যায় পরাক্রমে ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, অনেক সৈন্য তাঁহার পরাক্রমপ্রভাবে হত হইল; কিন্তু অন্যায় যুদ্ধে বিপক্ষগণ তাঁহাকে বীর্য্যহীন করিয়া ফেলিল দেখিয়া বালক উচ্চৈঃস্বরে দেবোপম পিতাকে আহ্বান করিতে লাগিল, হৃদয়-বিহীন যোদ্ধৃগণ সেই হৃদয়বিদারক শব্দ শুনিয়াও শুনিলনা। বালক হত হইলে উল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। ধর্ম্মনিষ্ঠ শান্তনুতনয় সে যুদ্ধে ছিলেননা; সেই লোমহর্ষণ ঘটনাশ্রবণে দুর্য্যোধনাদির প্রতি তাঁহার যে আন্তরিক অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল এস্থলে তাহা বর্ণন করা বাহুল্য মাত্র।

ভীষ্ম মধ্যস্থ থাকিবেন, কোন পক্ষ অবলম্বন করিবেন না, এই তাঁহার বাসনা ছিল। যাহাতে কুরুসংগ্রাম না হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টারও ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু বিধাতৃবিধান অনতিবর্ত্তনীয়। "যে দুর্য্যোধন বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ যুধিষ্ঠিরকে সুতীক্ষ্ণ সূচ্যগ্রে ভেদনোপযুক্ত ভূমির অর্দ্ধাংশও বিনাযুদ্ধে দিবেননা বলিয়া কঠোর উত্তরে বাসুদেবকে বিদায় করিলেন, একদিন তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ শত্রুহস্তে সম্প্রদান করিতে বাধ্য হইবেন, বীরোদ্যান ভারতের অপূর্ব্ব বীরকুসুম সকল কুরুপাণ্ডবের আত্মদ্রোহ-তুষারে নাশ করিয়া ফেলিবে;"—ভীষ্মদেব ভবিষ্যদ্বক্তার ন্যায় এই মহাবীর্য্য সংগ্রামের অনেক পূর্ব্বে এবং আপনি শরশয্যায় শয়ান হইয়া পরেও একবার বলিয়াছিলেন। কিন্তু জ্ঞানীর উপদেশ উপেক্ষিত হইল; ফল—আর্য্যজাতির অধঃপতন ও ভারতের সর্ব্বনাশ।

সংগ্রামবারণে ভীষ্মের চেষ্টা—ভীষ্মের উপদেশ উপেক্ষার ফল

---

# হিমালয়।

যখন আকাশ নির্ম্মেঘ, যখন ধূক্কুলার মাত্র সম্পর্ক নাই, সেই সময়ে—সেই সুখের শরৎ সময়ে—কেহ হিমালয়ের মধুরিমা দেখিয়াছ কি?

হিমালয়ের বিচিত্র প্রাকৃতিক দৃশ্য

একদিকে সমস্ত হিন্দুস্থান—শত যোজনব্যাপী মাঠের ন্যায়, অপরদিকে পর্ব্বতশ্রেণীর পর পর্ব্বত শ্রেণী, তাহার পরে কত পরে বরফের পাহাড় দেখিয়াছ কি? সেই শ্বেতস্বচ্ছ বরফের উপরে সূর্য্যকিরণ পড়িয়া ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে, বোধ হইতেছে যেন রাজপুত্রের আগমনে বিশাল নগরীসমূহ নানা দীপমালায় মণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে, দেখিয়াছ কি? পূর্ব্বে ও পশ্চিমে কেবল দেখিবে চূড়ার পর চূড়া, তাহার পর আবার চূড়া; শেষ নাই, বিরাম নাই, অনন্ত বলিলেও হয়। বর্ষা সম্প্রতি শেষ হইয়াছে, চারিদিকে ঝরণা হইতে ঝম্ ঝম্ রবে দুধের ফেণার মত সাদা জল বেগে পড়িতেছে, কোথাও তাহার উপর সূর্য্যের আলোকে রামধনু দেখা যাইতেছে, কোথাও কোন নির্ঝরিণী চির-অন্ধকারমধ্য দিয়া চিরকাল অলক্ষিত ভাবে প্রবাহিত হইতেছে, কেহ দেখিতেছে না, অথচ গতিরও বিরাম নাই। যেখানে ঝরণা, সেইখানেই গাছপালা, বন, আর যেখানে নাই, সেখানে ভীষণাকার প্রস্তর, কাছে গেলে বোধ হয়, এখনই ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে। এখানে এই ভয়ানক উচ্চতা, আবার পরক্ষণেই গভীর খড়, তাহার তলা কোথায়? দেখা যায় না, যদি দেখা যায়, দেখিবে একটি ক্ষুদ্র নদী চলিয়া যাইতেছে, উপলে উপলে জল লাফাইতেছে, নাচিতেছে, আর চলিতেছে। স্থানে স্থানে নীরস কঠিন তরুবর সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল কালের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আত্মরক্ষা করিতেছে, আর সেঁউতিলতা তাহাকে জড়াইয়া জড়াইয়া পাঁচশত বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া রহিয়াছে।

হিমালয়ের দৃশ্যের অপরিবর্ত্তনীয়তা—শরতে হিমগিরির সৌন্দর্য্য

এই হিমালয় তুমি আজি যেমন দেখিতেছ, ইহা অনন্তকাল এইরূপ, অনন্তকাল ধরিয়া বরফের পাহাড় এইরূপই আছে, ঝরণা এইরূপই বহিতেছে, আকাশও এইরূপ গাঢ় নীল, সবই এইরূপ। শরতেও হিমালয়ের এমনই গভীর অথচ মনোহর, ভয়ঙ্কর অথচ উন্মাদক সৌন্দর্য্য।



## আরব দেশ ও আরব জাতি।

আরব দেশ প্রকৃতির ভীষণ লীলাক্ষেত্র। চতুর্দ্দিকে দিগন্তপ্রসারিত অনন্ত বালুকারাশি ধূ ধূ করিতেছে, মধ্যে মধ্যে তরুলতাবিহীন, ভীমদর্শন পর্ব্বতশৃঙ্গ প্রান্তর হইতে উত্থিত হইয়া পথিকের মনে আতঙ্ক জন্মাইতেছে; মার্ত্তণ্ড মেঘচ্ছায়াবিরহিত আকাশ হইতে প্রখর রশ্মি-জাল বিস্তার করিয়া অকূল মরুসাগর অনল-সমুদ্রে পরিণত করিতেছে, বাত্যাসন্তাড়িত বালুকারাশি আন্দোলিত হইয়া গগনমণ্ডল তমসাচ্ছন্ন করিতেছে। ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশ, নিম্নে দিগ্বলয়ব্যাপী মরুক্ষেত্র;—সে শ্মশানময় মরুক্ষেত্রে খর্জ্জুরবৃক্ষগুলি আকাশ ভেদ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সে মরুক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে সজলা, তৃণাচ্ছাদিতা উর্ব্বরা ভূমি, তুলনায় চতুর্দ্দিকের দৃশ্য আরও ভীষণ করিতেছে। পর্ব্বতপদপ্রান্ত হইতে সুনির্ম্মলা স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইতেছে, কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই মহাতৃষ্ণার্ত্ত মরুক্ষেত্র তাহাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। কোথাও বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে, একবিন্দু বারিধারাও আকাশ হইতে পতিত হইতেছেনা। সমুদ্রের বেলাভূমিতে প্রতিষ্ঠিত জনপদ ব্যতীত আরব দেশের সর্ব্বত্র এই ভীষণ দৃশ্য।

মরুভূমি-ভীষণ আরবের দৃশ্য

এই ভীষণ দেশে তিন শ্রেণীর লোক বাস করিত। এক শ্রেণীর লোক নগরে বাস করিয়া আফ্রিকা, পারস্য ও ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য করিত। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক উষ্ট্রের সাহায্যে মরুভূমির মধ্য দিয়া বাণিজ্যদ্রব্য বহন করিয়া মিসর, পালেস্তাইন ও সিরিয়া দেশে যাতায়াত করিত। তৃতীয় শ্রেণীর লোক অশ্ব, উষ্ট্রপাল ও মেষপাল লইয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইত। ইহাদের বাস করিবার

আরবের অধিবাসী ও তাহাদিগের প্রকৃতি—বেদুইন আরব

গৃহ ছিলনা, দশদিন অবস্থিতি করিবার স্থান ছিলনা, ইহারা নির্জ্জন প্রান্তরে বা দুর্গম মরুভূমিতে পরিভ্রমণ করিয়া জীবন যাপন করিত। এই শ্রেণীর আরবগণ বেদুইন নামে বিখ্যাত। কত রাজার রাজ্যপাট ধ্বংস হইয়া গেল, পৃথিবীময় কত পরিবর্ত্তনের স্রোত প্রবাহিত হইল, কিন্তু আজিও বেদুইন জাতির কোন পরিবর্ত্তন হইলনা। বেদুইন জাতিই আরবের প্রধান অধিবাসী। ইহারা স্বাধীনতাকে প্রিয় জ্ঞান করিয়া পর্ব্বত ও প্রান্তরে বাস করিতে ভালবাসে। ইহারা বলে, "পরমেশ্বর আমাদিগকে মুকুটের পরিবর্ত্তে উষ্ণীষ, দুর্গের পরিবর্ত্তে খড়্গ, গৃহের পরিবর্ত্তে বস্ত্রাবাস ও আইনের পরিবর্ত্তে কবিতা দান করিয়াছেন।" ইহারা কাহারও শাসন মানেনা, আকাশের বিহঙ্গের ন্যায়, মরুভূমির সঞ্চরমান বায়ুর ন্যায়, সর্ব্বত্র স্বাধীনভাবে বিচরণ করে। ইহারা নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত—অহনিশ বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও যুদ্ধানল জ্বলিয়া রহিয়াছে। ইহারা বৎসরের মধ্যে চারিমাস পুণ্যমাস মনে করিয়া যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত থাকিত এবং ঐ কয়েক মাস অস্ত্র হইতে ফলক খুলিয়া রাখিত। এই পুণ্যমাসে যদি তাহারা আপনাদের পিতৃঘাতক কি মাতৃ-ঘাতকেরও দেখা পাইত, তথাপি তাহার শত্রুতা করিতনা।

ইহাদের কোন প্রকার সামাজিক শাসন ছিলনা। ইচ্ছা হইলে একবার বহু স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিত, অসুবিধা হইলে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অকূলে ভাসাইয়া দিতেও ইতস্ততঃ করিত না। কন্যা জন্মিলে অমঙ্গল জ্ঞান করিয়া জীবিতাবস্থায় তাহাদিগকে সমাধিস্থ করিত। ইহারা চৌর্য্য ব্যবসায় দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিত। মরুভূমির মধ্যে বণিক দেখিলে সুদূর স্থান হইতে অকস্মাৎ বায়ুবেগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া চক্ষের নিমেষে কোথায়

বেদুইনদিগের সামাজিক প্রথা—দস্যুতা ও আতিথেয়তা

চলিয়া যাইত। কিন্তু আতিথ্য-ধর্ম্ম পালনেও ত্রুটি করিতনা। অতিথিকে আপন বস্ত্রাবাসে আশ্রয় দিবার জন্য ইহারা পরস্পরের শোণিতপাত করিতেও ভ্রূক্ষেপ করিতনা। রাত্রিকালে পথভ্রান্ত পথিকগণ যাহাতে তাহাদের শিবির দর্শন করিতে পারে, তজ্জন্য পর্ব্বত-শিখরে অগ্নি জ্বালিয়া রাখিত। যে একবার ইহাদের সঙ্গে আহার করিতে পারিত, তাহার আর শত্রুভয় ছিল না।

আরবদিগের দেবমহিমার অনুভব ও দেবোপাসনা

প্রান্তরবাসী আরবগণ উষাকালে পূর্ব্বদিকে তরুণ তপনের বিচিত্র সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইত। মধ্যাহ্নকালে মরীচিমালীর প্রখর কিরণে দগ্ধ হইয়া তাহার অপরিসীম ক্ষমতা অনুভব করিত। দিবাবসানে সে সূর্য্য পশ্চিমে ডুবিয়া যাইত, অন্ধকার অনন্ত আকাশ ছাইয়া ফেলিত, ধীরে ধীরে একটি দুইটি করিয়া অগণ্য নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিত, দেখিয়া দুর্দ্দান্ত আরব-হৃদয় স্তম্ভিত হইত, হস্ত দুইটি ঊর্দ্ধদিকে বিস্তৃত ও জানুদ্বয় অবনত করিয়া, বিস্ময়ে ভক্তিভরে তাহাদের স্তুতি করিত। নির্ম্মল নীলাকাশে যখন চন্দ্রমা বিমল জ্যোতিঃ বিকীরণ করিয়া উদিত হইতেন, তখনকার সে শোভা দর্শনে বর্ব্বর আরবগণ বিহ্বল হইয়া তাহার পূজা করিত। নীরব রজনীতে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী উদিত হইতেছে, সজীব পদার্থের ন্যায় অনন্ত আকাশে পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহাদের পরিক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বর্ষা হইতেছে, পাষাণ ভেদ করিয়া তৃণগুচ্ছ দেখা দিতেছে, বৃক্ষ ফল ফুল প্রসব করিতেছে,—ইহাদিগকেই জগতের নিয়ন্তা মনে করিয়া আরবেরা তাহাদের উপাসনা করিত।

অশ্ব, উষ্ট্র প্রভৃতি জন্তু ও নানাপ্রকার বৃক্ষ, পর্ব্বত ও প্রস্তর প্রভৃতির পূজাও বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক বংশের ভিন্ন ভিন্ন ইষ্টদেবতা ও তাহার মন্দির ছিল ;—উপাসকগণ দেবতার মনস্তুষ্টির জন্য

নরবলি দিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিত। মক্কা নগরের কাবা নামক দেবমন্দির আরব দেশবাসী সর্ব্বজাতির সম্ভজনীয়। খৃষ্টাব্দের বহু পূর্ব্বেও এই মন্দির আরব দেশে প্রসিদ্ধ ছিল। কাবা মন্দিরে ৩৬০টি দেব-প্রতিমা ছিল। আরবগণ বৎসরের এক এক দিন তাহার এক এক প্রতিমার পূজা করিত।

পূজাপদ্ধতি—দেবমন্দির ও দেববিগ্রহ

মহম্মদের জন্মের বহু পূর্ব্বে য়িহুদীগণ আরব দেশের নানাস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। যখন রোমকগণ পালেস্তাইন জয় করিয়া য়িহুদীদের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল, যখন জেরুজালেম নগর ধ্বংস হইয়া গেল, তখন বহুসংখ্যক য়িহুদী স্বদেশত্যাগ করিয়া জন্মের মত আরব দেশে বাসস্থান নির্ম্মাণ করে। এইরূপে তাহাদের দ্বারা য়িহুদী ধর্ম্ম আরব দেশে আনীত হইয়াছিল। কিন্তু য়িহুদীগণও পৈতৃক ধর্ম্ম একেশ্বরবাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক ঈশ্বরের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিত। তাহারা আরবগণকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের আদর্শ দেখাইতে সক্ষম হয় নাই।

আরবে য়িহুদী উপনিবেশ ও য়িহুদী ধর্ম্ম

খৃষ্টান ধর্ম্ম ও আরব দেশে প্রবেশ করিয়াছিল। স্বয়ং সেণ্টপল্ আরব দেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য গমন করিয়াছিলেন। স্বদেশে নিগৃহীত হইয়া খৃষ্টসন্ন্যাসিগণ আরব দেশের গিরি গুহায় আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের দ্বারাই খ্রীষ্টধর্ম্মতত্ত্ব ঐদেশে প্রচারিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টানগণও ঘোর পৌত্তলিক হইয়া গিয়াছিলেন। মেরি ও যীশুর প্রতিমা-পূজাই তাঁহাদের ধর্ম্মের সারতত্ত্ব ছিল। তাঁহারাও ধর্ম্ম বিষয়ে আরবদিগকে কোন উচ্চ আদর্শ দেখাইতে পারিলেননা। খৃষ্টধর্ম্ম আরব-হৃদয়ে স্থান পাইলনা।

আরবে খ্রীষ্টধর্ম্ম

এসিয়ার আর সর্ব্বত্রই ঘোর পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের জয়-পতাকা লইয়া নির্ব্বাণমুক্ত ভিক্ষুগণ এসিয়ার সকল দেশেই বুদ্ধদেবের করুণ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্দ্ধর্ষ-প্রকৃতি বেদুইন জাতির নিকট সে ধর্ম্ম পঁহুছিতে পারিলনা; য়িহুদী বা খ্রীষ্টধর্ম্ম যাহাদিগের হৃদয়ে স্থান পাইলনা, সেই দুর্দ্দান্ত জাতিকে অজ্ঞানতার মহান্ধকার হইতে উদ্ধার করিবার জন্য, বর্ব্বর আরব ক্ষেত্রে জ্ঞানালোক বিস্তার করিবার জন্য, অবিশ্রান্ত যুদ্ধনিমগ্ন যাযাবরদিগকে ঐক্যযন্ত্রে একসূত্রে গ্রথিত করিয়া প্রবল পরাক্রান্ত জাতিতে পরিণত করিবার জন্য এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইল। ইনিই মহাপুরুষ মহম্মদ।

বেদুইনের বিবিধ ধর্ম্ম-বিমুখীনতা—মহাপুরুষ মহম্মদের আবির্ভাব



## মধুসূদনের উচ্চাভিলাষ ও বিদ্যানুরাগ।

উচ্চাভিলাষই মহত্ত্বের ভিত্তিভূমি। উচ্চাকাঙ্ক্ষা ব্যতীত জ্ঞান, ধর্ম্ম, অর্থ,—কোন বিষয়েই মনুষ্য শ্রেষ্ঠতা-লাভে সমর্থ হয়না। মহত্ত্ব-বীজ এই উচ্চাভিলাষ, বাল্য হইতেই মধুসূদনের প্রকৃতিতে লক্ষিত হইত। সমকালবর্ত্তী লেখকগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইব, পূর্ণবয়সে ইহাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল, এবং যতদিন না তাঁহার সে আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইয়াছিল, ততদিন তিনি নিরস্ত হন নাই।

মধুসূদনের উচ্চাভিলাষ ও আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি-সাধনে একনিষ্ঠ সাধনা

তাঁহার বাল্যের উচ্চাভিলাষ, তাঁহার জননীর প্রদত্ত উৎসাহবাক্যে এবং তাঁহার পিতার আদর্শে সম্যক্ পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। তাঁহার জননী অতি সম্ভ্রান্ত গৃহের দুহিতা ছিলেন। পিতৃকুলের সম্ভ্রম এবং কৃতী স্বামীর ও প্রতিভাবান্ পুত্রের গৌরবে তিনি আপনাকে গৌরবান্বিতা মনে করিতেন। সাধারণ নারীগণের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর প্রবৃত্তি তাঁহার হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইতনা। মহদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিলে যে মহদভিলাষ মনুষ্যের হৃদয়ে স্বভাবতঃ উদিত হইয়া থাকে, জাহ্নবীদাসী মেধাবী পুত্রের হৃদয়ে তাহা বদ্ধমূল করিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন। মধুসূদনের পিতাও, তাঁহার সমসাময়িকদিগের মধ্যে একজন প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যবহারাজীব ছিলেন। পিতার সম্ভ্রম ও কৃতিত্ব বালক মধুসূদনকে মহত্ত্বলাভে প্রণোদিত করিত। সেইজন্য লেখাপড়া সম্বন্ধে তাঁহাকে, কোন দিন, কাহারও তাড়না করিবার প্রয়োজন হয় নাই; নিজের উচ্চাভিলাষ ও আন্তরিক বিদ্যানুরাগ-গুণেই তিনি বঙ্গদেশের একজন

মধুসূদনের মাতা পিতা



যোগীন্দ্রনাথ বসু।

অগ্রগণ্য বিদ্বান্ হইয়াছিলেন। কি পঠদ্দশায়, কি শিক্ষকতা কার্য্যের সময়, কি ব্যারিষ্টারাবস্থায়, মধুসূদন কখনও বিদ্যোপার্জ্জন সম্বন্ধে অযত্ন প্রকাশ করেন নাই। ছাত্রাবস্থায় হিন্দু কলেজে থাকিতে তিনি যেমন যত্ন-সহকারে গ্রন্থাভ্যাস করিতেন, মান্দ্রাজে শিক্ষকতা কার্য্য করিবার সময়েও তেমনই করিতেন। মান্দ্রাজে থাকিতে তেলেগু, তামিল, হিব্রু ও সংস্কৃত ভাষা এবং ফ্রান্সে থাকিতে ফরাসিস্, জর্ম্মাণ ও ইতালীয় প্রভৃতি ভাষা-শিক্ষার জন্য তিনি দেহ-মন নিয়োজিত করিয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকালয় এবং লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম, যখনই যেখানে সুবিধা পাইয়াছিলেন, তখনই সেখান হইতে গ্রন্থরাশি আনাইয়া, নিজের জ্ঞান-পিপাসা পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। রোগ, দরিদ্রতা এবং পারিবারিক অশান্তি প্রভৃতি যে সকল বিঘ্ন মনুষ্যের জ্ঞান-লালসা বিশুষ্ক করিয়া দেয়, মধুসূদনের জীবনে তাহার কোনটিরই অভাব ছিলনা; কিন্তু নিত্যপ্রবহনশীল উৎসের ন্যায় তাঁহার জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহা, সংসারের কঠোর নিদাঘতাপের মধ্যেও তাঁহার হৃদয় হইতে নিরন্তর নিঃসৃত হইত। এই জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা এবং কাব্যানুরক্তি সম্বন্ধে তিনি তাঁহার কোন সম্ভ্রান্ত বন্ধুকে এইরূপ লিখিয়াছিলেন,—

মধুসূদনের অবিচলিত বিদ্যানুরাগ ও অক্লান্ত বিদ্যানুশীলন—জ্ঞান-চর্চ্চায় সাংসারিক দুঃখের নিবৃত্তি

"এ ধরার কর্ম্মভার মন বেদনিলে,
কার করপদ্ম-স্পর্শে সারে সে বেদনা,
বরদার দয়াসম? হাত বুলাইলে
জননী, ব্যথিত দেহে, কোথা ব্যথা থাকে?
একথা তোমার কাছে অবিদিত নহে।"

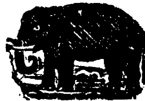
সংসার-যন্ত্রণায় নিপীড়িত হৃদয় যে বাগ্দেবীর "করপদ্ম-স্পর্শে" সমস্ত যন্ত্রণা বিস্মৃত হইতে পারে, মধুসূদন আত্মজীবনে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

## মধুসূদনের জন্মভূমির সৌন্দর্য্য।

প্রকৃতির অতি সৌন্দর্য্যময় নিকেতনে মধুসূদনের শৈশব অতিবাহিত হইয়াছিল। এক্ষণে ম্যালেরিয়ার প্রকোপে ভ্রষ্টগৌরব হইলেও, তাঁহার জন্মভূমি সাগরদাঁড়ী অতি সুকোমল গ্রাম্য শোভায় পূর্ণ। নদী, প্রান্তর এবং বৃক্ষলতা প্রভৃতি যে সকল উপাদান লইয়া বঙ্গের পল্লী-গ্রামের সৌন্দর্য্য, তাহার কোনটিরই সেখানে অভাব নাই। নির্ম্মলসলিলা কপোতাক্ষী, ইহার তিন দিক্ বেষ্টন করিয়া, ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষশ্রেণী, শাখায় শাখায় সম্বদ্ধ হইয়া, স্থানে স্থানে, তাহার উপর অবনত হইয়া পড়িয়াছে। শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত ভূমি, নদীর তট হইতে জলের রেখা পর্য্যন্ত, প্রসারিত রহিয়াছে। নগরের কৃত্রিমতার সঙ্গে সেখানকার কোন সম্বন্ধ নাই। প্রকৃতি অতি সরল, গ্রাম্যমূর্ত্তিতে সেখানে বিরাজিতা। নদীজলে কুলললনাগণ স্নানাবগাহন করিতেছেন; ক্ষুদ্র, বৃহৎ নানাপ্রকারের তরণীসমূহ নদীবক্ষে গমনাগমন করিতেছে; কৃষকবনিতাগণ, কলসীকক্ষে নদীতটে দণ্ডায়মান হইয়া, একদৃষ্টিতে তাহাদের পানে চাহিয়া রহিয়াছে; রাখালবালকগণ পশুপাল ছাড়িয়া, ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিতেছে; দেখিলে নগরের কোলাহল বিস্মৃত হইয়া, সেই সরল, গ্রাম্য সৌন্দর্য্যে মগ্ন হইয়া যাইতে হয়। কপোতাক্ষীর পশ্চিম দিকে দূরপ্রসারিত শ্যামল প্রান্তর; নদীর উভয়তটে, বৃক্ষলতার অন্তরালে, স্থানে স্থানে কৃষকদিগের কুটীর; মধ্যে মধ্যে দুই একটি প্রাচীন বট বা অশ্বত্থ বৃক্ষ। উদ্যানজ তরুসমূহের ঘনসন্নিবেশে গ্রামটী মধ্যাহ্ন কালেও ছায়াপূর্ণ। মধুসূদনের কণ্ঠস্বর নীরব হইয়াছে; কিন্তু তাহার

সাগর দাঁড়ীর প্রাকৃতিক দৃশ্য-বৈচিত্র্য—পল্লী-শোভা—কপোতাক্ষবক্ষে ও কপোতাক্ষতটে পল্লী-জীবনের বিচিত্র লীলাভিনয়

জন্মভূমির বিহঙ্গগণের সঙ্গীতের বিরাম হয় নাই। পাপিয়ার গগনপ্লাবী কণ্ঠস্বরে এখনও তাহা পূর্ব্বের ন্যায়, দিবারাত্রি প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কত অযত্নসম্ভূত তরুলতা, উদ্যানজ বৃক্ষরাজীর সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া, গ্রামটীকে আরণ্য শোভায় অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। মধুসূদনের পৈতৃক বাসভবনের অদূরবর্ত্তী নদীতটে দণ্ডায়মান হইয়া, একবার, জ্যোৎস্নালোকে, পাপিয়ার দিগন্তপ্লাবী সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে, নিস্তব্ধ গ্রামটীর এবং ধীরবাহিনী কপোতাক্ষীর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে, অতি নীরস হৃদয়ও কবিজনোচিত সরসভাবে পূর্ণ হয় এবং গ্রামটীকে স্কটের ভাষায় "কবি পুত্রের উপযুক্ত ধাত্রী" বলিতে ইচ্ছা করে। নিদাঘের জ্যোৎস্নালোকে যিনি কপোতাক্ষীর সৌন্দর্য্য দর্শন করিবেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, মধুসূদন যে তাহাকে দুগ্ধস্রোতের সহিত তুলনা করিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত হয় নাই।



# মোগল সম্রাটগণের বিদ্যানুরাগ।

আকবরের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা

তৈমুর লঙ্গের বংশধরগণের মধ্যে যাঁহারা এই হিন্দুপ্রধান, বহুবিধ জাতি ও ভাষাসংকুল ভারতে শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আকবর সাহ সর্ব্বাগ্রণী। তাঁহার প্রতিভা সর্ব্ববিষয়িণী ও সর্ব্বতোমুখী। তাঁহার বুদ্ধি সকল বিষয়ে সম্প্রসারিণী শক্তির অনুগামিনী। সেই প্রতিভা, সেই বুদ্ধি লইয়া, তিনি ভারতে মোগলশাসনের প্রস্তরময় ভিত্তিমূল স্থাপিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ভবিষ্যৎ বংশধরগণের মধ্যে সেই প্রতিভার অভাব হওয়াতে, তাঁহারা সহজেই সেই দৃঢ়বক্ষ ভিত্তিকে অকালে বিদীর্ণ করিয়া, সুবিস্তৃত ও সুদূরসম্প্রসারিত মোগলরাজত্বের ধ্বংস সাধন করেন।

আকবরের শ্রেষ্ঠত্ব

কি রণ-প্রাঙ্গণে, কি প্রমোদোদ্যানে, কি ধর্ম্মানুশীলনে, কি প্রজাপালনে, কি বিগ্রহ ও শত্রুদমনে, কি সাম্যনীতি বা শাসনদণ্ড-পরিচালনে, আকবর সাহ যে অতুলনীয় প্রতিভার বিকাশ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাতে সর্ব্বদেশীয় সম্রাট্‌মণ্ডলীতে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

আকবরের উন্নত প্রতিভা--বিবিধ প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম

সিংহাসনচ্যুত, রাজ্য হইতে বিতাড়িত, বন্ধু বান্ধব ও পারিষদবিহীন, দুর্দ্দিনগ্রস্ত পিতার দুরবস্থার সময়ে, বালুকাময় মরু-প্রান্তরে জন্ম গ্রহণ করিয়া, বাল্যাবস্থায় প্রথম কয়বৎসর ক্রূরাগত জ্ঞাতিদিগের অত্যাচার, উপদ্রব ও পিতৃপরিত্যক্ত বিদ্রোহীপূর্ণ রাজ্যের শান্তিস্থাপনে নিযুক্ত থাকিয়া, শৈশব হইতে কঠোরতা, শ্রম-সহিষ্ণুতা ও বিপদ-জালে পরিবেষ্টিত হইয়া, ঊষর ক্ষেত্রে নিহিত বীজের



হরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

ন্যায় যাঁহার পূর্ণতাবিকাশের সমস্ত ক্ষমতা লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তিনি যে অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে একজন সর্ব্বপ্রধান, শ্রেষ্ঠ-প্রতিভাশালী সম্রাট্ হইয়া উঠিলেন, তাহা উন্নত প্রতিভার জ্বলন্ত সাক্ষ্যরূপে ইতিহাসের প্রত্যেক পত্রে আজও দেদীপ্যমান।

আকবরের বাল্যশিক্ষা

বাল্যে সুশিক্ষা, কৈশোরে তাহার উন্নতি, আকবরের অদৃষ্টে ঘটে নাই। তিনি জন্মিয়াছিলেন পিতার ঘোরতর দুর্দ্দশার সময়ে, এবং তাঁহার শিক্ষা-কাল যুদ্ধ-বিগ্রহে কাটিয়াছিল। বাল্যে তাঁহার শিক্ষালাভ সম্বন্ধে আবুল ফজল কেবল একস্থলে বলিয়াছেন,—"পঞ্চম বর্ষে আকবরের অক্ষরশিক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল।" কিন্তু নিজামউদ্দিন আহম্মদ নামক আর একজন সমসাময়িক ইতিবৃত্ত-লেখক ইহার আর একটু পরিস্ফুট বিবরণ দিয়াছেন। তিনি বলেন,—

আকবরের বিদ্যারম্ভ—জ্যোতির্ব্বিদের ভবিষ্যদ্বাণী—শিক্ষালাভে বিফলতা

"৯৫৩ হিজিরায় (১৫৪৬ খৃঃ) ৭ই সওয়ালে যখন আকবর চারি বৎসর, চারিমাস ও চারি-দিন বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হন, সেই সময়ে তাঁহার প্রথম অক্ষর-পরিচয় আরম্ভ হয়; মৌলানা আজিমুদ্দিন, তাঁহার প্রথম শিক্ষকরূপে নিয়োজিত হন। বাদসাহ হুমায়ুন, হিন্দু-জ্যোতিষ বিশ্বাস করিতেন, এবং নিজে ও একজন জ্যোতির্ব্বিদ্ ছিলেন। তিনি শুভদিন দেখিয়া শুভলগ্নে পুত্রের অক্ষর-পরিচয় করাইবার সময় নির্দ্দেশ করেন। আকবর, এই সময়ে বাল্যস্বভাবসুলভচাপল্যে একটু আমোদ করিবার জন্য, প্রাসাদের একস্থানে লুক্কায়িত হন। অনেক খুঁজিয়া তাঁহাকে সেই স্থান হইতে বাহির করা হইল। জ্যোতির্ব্বেত্তারা বলিলেন, সাধারণ মানবে যাহাকে 'শিক্ষা' বলে, তাহা এই বালকের হইবেনা বটে, কিন্তু কালক্রমে, অন্তর্নিহিত কোনও এক গুপ্ত শক্তির সহায়তায়, এই বালক যশের সর্ব্বোচ্চ শিখরে সমাসীন হইবে। যে শিক্ষা

মানুষের প্রদত্ত নহে, তাহাতে ঈশ্বরের হস্ত দেদীপ্যমান থাকিবে।” শুভলগ্ন উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়াতেই হউক, বা অন্য কোন কারণেই হউক, আকবর তাঁহার প্রথম শিক্ষক আজিমুদ্দিনের নিকট কিছুতেই শিক্ষায় কৃতিত্ব লাভ করিতে পারিলেননা। ইহার পর, বায়াজিদ্ নামক আর এক পণ্ডিত তাঁহার শিক্ষকতা করেন—তিনি ও হাল ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, “এ বালক পার্থিব শিক্ষায় মনোযোগী নহে—ঈশ্বর ইহাকে কোনও উচ্চতম শিক্ষার উপযোগী করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

হুমায়ুন বাদসাহ হাল ছাড়িলেননা; তিনি মুনিম্ খাঁকে তাঁহার শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। মুনিম্ খাঁ বাদসাহের উপদেশ অনুসারে, আক্ষরিক শিক্ষার সহিত রাজ্য-শাসন ও রাজনীতিসম্বন্ধে মহম্মদীয় শাস্ত্রের উপদেশ, সেই কোমলমতি বালকের মস্তিষ্কে প্রবেশ করাইতে লাগিলেন। অশ্বারোহণ, শস্ত্রবিদ্যা, তীর ও বর্ষাচালন, তরবারি ও বন্দুকের ব্যবহার শিক্ষা, তাঁহার আক্ষরিক শিক্ষার সহিত পরিস্ফুট হইতে লাগিল।

বিবিধ বিদ্যানুশীলন

ইহার পর হুমায়ুনের অপঘাত মৃত্যু হইল। খাঁ খানান বৈরাম খাঁকে তিনি কুমার জালাল উদ্দিনের অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন। বৈরাম খাঁর ন্যায় উপযুক্ত লোক আকবরের বাল্যশিক্ষার পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন, ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্ব

বৈরাম নিজে একজন কৃতবিদ্য পুরুষ। বাল্থ্ তৎকালে সমস্ত বিদ্যাভ্যাসের কেন্দ্রস্থল ছিল। তিনি বাল্যজীবনে বাল্থের পণ্ডিতদিগের নিকট ইতিহাস, কবিতা ও দর্শন শিক্ষা করিয়াছিলেন। হুমায়ুনের ন্যায় তিনি ও পণ্ডিতমণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার সময়ে, দিল্লীর রাজসভা অনেক তাতার ও পারসীক পণ্ডিতে

পরিপূর্ণ ছিল। তিনি তাঁহার নিজের জীবনের আদর্শে, আকবরের উপর সাংসারিক শিক্ষা প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মীর আবদুল লতিফ নামক একজন মৌলভীকে পুনরায় আকবরের শিক্ষার ভার দেওয়া হইল। ইঁহার যত্নে আকবর কতকগুলি "গজল" ও হাফিজের কবিতা কণ্ঠস্থ করিলেন। কিন্তু লেখনীচালনে তাঁহার কোনও দক্ষতা লক্ষিত হইলনা।

বৈরামের বিদ্যাবত্তা—বিদ্বজ্জনসেবিত রাজসভা—বৈরামের আদর্শে আকবরকে শিক্ষাদানের প্রয়াস—আকবরের কবিতাশিক্ষা

বাল্যশিক্ষা, জীবনের উন্নতির ভবিষ্যৎ ভিত্তি, বাল্যশিক্ষক তাহার আদর্শ। পিতামাতার প্রকৃতির ন্যায়, অনেক সময় সুশিক্ষকের প্রকৃতি ছাত্রের বাল্যজীবনে প্রতিভাসিত হয়। মীর আবদুল সাম্যদর্শী ছিলেন। তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল—"সাম্যবাদই জীবনের সুখ"। ধর্ম্মমতসম্বন্ধে পারস্যে তিনি "সিয়া" বলিয়া পরিচিত ছিলেন, কিন্তু হিন্দুস্থানে তাঁহাকে "সুন্নি" বলিয়া সকলে জানিত।

বাল্যশিক্ষা এবং বাল্যশিক্ষক

এই সুশিক্ষকের সহায়তায় আকবরের প্রথম জীবনে সাম্যনীতির ক্ষীণ দীপ্তি প্রতিফলিত হয়। এই তেজ পরে কিরূপ প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল, যাঁহারা তাঁহার জীবনী সবিশেষ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহা অবগত আছেন।

আকবরের জীবনে সাম্যনীতির প্রভাব

তৈমুরবংশের সকলেই বিদ্যালোচনা ভালবাসিতেন। সুপ্রসিদ্ধ তৈমুর হইতে হুমায়ুন পর্য্যন্ত বাদসাহের ইতিবৃত্ত হইতে তাঁহাদের সকলকেই বিদ্যোৎসাহী বলিয়া জানিতে পারা যায়। সুপ্রসিদ্ধ কবি হাফেজ, তৈমুর লঙ্গের সমকালবর্ত্তী। হাফেজ কেবল যে স্বদেশীয়দিগের

মধ্যে বিশেষরূপে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। তৈমুর অনেক সময়ে, তাঁহার স্পষ্টবাদিতায় সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে প্রচুররূপে পুরস্কৃত করিতেন। তৎকালে বিজ্ঞান ও অন্যান্য শিল্পবিদ্যার যতদূর প্রচলন হইয়াছিল, তৈমুর নিজের সাধের নগরী সমরখন্দ ও বোখারায়, তৎসম্বন্ধীয় পণ্ডিতদিগের যথাসম্ভব একত্র সমাবেশ করিয়াছিলেন।

তৈমুরবংশীয়দিগের বিদ্যানুরাগ—কবি হাফেজ —তৈমুরের রাজসভায় শিল্প-বিজ্ঞানবিদ্‌গণের সমাবেশ

তৈমুরবংশের মধ্যে বাবরের সহিত ভারতের সিংহাসন লইয়া প্রথম সম্বন্ধ। এ সম্বন্ধ কিছু বিশেষত্ববিশিষ্ট। বাবর ভারতে মোগল রাজবংশের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন। সাহস একদিকে যেমন তাঁহাকে যশঃ ও প্রতিভার সিংহাসনে বসাইয়া দিয়া গিয়াছে, আবার অন্যদিকে শিক্ষা ও তাঁহাকে পণ্ডিত-দিগের অগ্রণী করিয়া তুলিয়াছে। পদ্য ও বিজ্ঞান পরস্পর বিরুদ্ধাচারী বিষয়, বাবর এই দুই বিষয়েই দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিজের যে জীবনবৃত্ত লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রকৃত শব্দশাস্ত্রবিৎ ও সাহিত্য-পারদর্শীর প্রকৃত প্রতিভার পরিচায়ক। সমগ্র ইউরোপীয় জাতির মুখে সালাদিনের প্রশংসা ধরেনা। কিন্তু বাবরের ইতিবৃত্ত অবগত হইবার যদি তাঁহাদের কোনও উপায় থাকিত, হয়ত, তাঁহারা বাবরকেই শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিতেন। "তারিখী রশিদ" গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, বাবর "তুরকী দেওয়ান" নামক এক কবিতাগ্রন্থ ও তৎকালীনসমাজপ্রচলিত আইন-কানুনের এক বহুশ্রমসাধ্য টীকাও প্রস্তুত করেন। সঙ্গীত, কবিতা, দর্শন, শাসনবিধি, ধর্ম্মশাস্ত্র,—সকল বিষয়েই তিনি দুই একখানি পুস্তক রাখিয়া গিয়াছেন। বাবরের

বাবরের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য—বিদ্যাশিক্ষার চরমোৎকর্ষ—জীবনবৃত্ত ও বিবিধ বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন

জীবন যুদ্ধ-ব্যবসায়েই পর্য্যবসিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যেও যখন তিনি এতদূর বিদ্যাশিক্ষার চরমোৎকর্ষ দেখাইয়াছেন, তখন তাঁহার প্রতিভা প্রকৃতই মানবীয় গৌরবের পরিচয়স্থান।

হুমায়ুনের অপূর্ব্ব অধ্যায়নসক্তি

হুমায়ুন বাদসাহ পিতার স্বভাব পাইয়াছিলেন। সুখ-দুঃখ, বিলাস-সম্ভোগ, যুদ্ধবিগ্রহ সকল অবস্থাতেই তিনি অবকাশ পাইলেই পুস্তক পাঠ করিতে ছাড়িতেননা। অঙ্কশাস্ত্র ও জ্যোতির্ব্বিদ্যা তাঁহার যথেষ্ট আয়ত্তাধীনে ছিল। তিনি এক প্রকার "গ্রন্থকীট" শ্রেণীর লোক; কারণ আমরা দেখিতে পাই, রাজ্য ছাড়িয়া পলায়নের সময়েও তিনি ও তাঁহার পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ, কয়েকখানি বাছা বাছা পুস্তক লইতে বিস্মৃত হন নাই। দিল্লীর সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া, তিনি সেরসাহার এক মর্ম্মর প্রস্তরময় বিস্তৃত প্রাসাদে বহুগ্রন্থাদিপূর্ণ এক পুস্তকাগার স্থাপন করেন। দিবারাত্রি সেইস্থানে বসিয়া গ্রন্থপাঠ করিতে পাইলে, তিনি অন্য কর্ত্তব্য ভুলিয়া যাইতেন। এই গ্রন্থাগারই তাঁহার জীবনের শেষ লীলাক্ষেত্র; ইহারই অধিরোহিণীশ্রেণী হইতে স্খলিতপদ হইয়া তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

আকবরের বিবিধ শাস্ত্রাধ্যয়ন ও বিবিধ বিদ্যাচর্চ্চার উৎসাহ দান

পিতৃ পিতামহের ও চাঘ্‌টাই মোগলবংশের পৈতৃক রীতি অনুসারে, আকবরের হৃদয়ে বাল্যশিক্ষা-প্রবৃত্তি, যৌবনে সেই শিক্ষার সম্যক্‌ স্ফূর্ত্তি ও প্রৌঢ়াবস্থায় তাহার চরমোন্নতি, ইহাই সম্ভবতঃ আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু বাবর ও হুমায়ুন যেরূপ ভাবে বাল্যশিক্ষার অবসর পাইয়াছিলেন, যৌবনে তাহার পরিচালনার সুযোগ পাইয়াছিলেন—আকবর সাহ দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার অনেকাংশেই বঞ্চিত হইয়াছিলেন। তথাপি তিনি ভবিষ্যৎ জীবনে, চেষ্টা, উদ্যোগ, পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও দৃঢ়তা সহকারে সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন

ও তাহার রসাস্বাদ করিয়া অধীত বিদ্যার এতদূর সমুচ্চ শিখরে উঠিয়াছিলেন যে, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। সকল প্রকার সুকুমার সাহিত্যের ও শিল্পের, বিজ্ঞান ও দর্শনের উন্নতি, তাঁহার দীর্ঘ রাজত্বকালের মধ্যে যেরূপ দৃঢ়গতিতেও স্থায়ীভাবে সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহা ইতিহাস-পাঠকের অবিদিত নাই।

রাজ্যমধ্যে যাহাতে সর্ব্ববিষয়িণী সাধারণ শিক্ষার প্রচলন হয়, আকবর সাহ তৎসম্বন্ধে একটি আইন প্রচার করিয়াছিলেন। তাহার এক অংশে লিখিত আছে, "প্রত্যেক বালকের উচিত যে, সে প্রতিদিন কোনও না কোনও নীতিগ্রন্থ পাঠ করে। অঙ্কশাস্ত্র, কৃষিবিদ্যা, পরিমিতি, জ্যামিতি, বিজ্ঞান, ব্যায়ামশাস্ত্র, গার্হস্থ্যনিয়মবিধায়ক গ্রন্থ, রাজনীতিপূর্ণ পুস্তক, চিকিৎসাবিদ্যা, ন্যায়শাস্ত্র ও ইতিহাস প্রভৃতি পাঠে মানবজীবনে শিক্ষা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। প্রত্যেক লোকেরই উচিত, তাহাদের সন্তান সন্ততিদিগকে এই প্রকারে এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে শিক্ষা প্রদান করিয়া তাহাদের উন্নতির পথ দেখাইয়া দেওয়া। এতদ্ব্যতীত "তবিলী", "রিয়াজি" ও "ইলাহি" নামক ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের ধর্ম্ম ও দর্শনশাস্ত্র সকল শিক্ষিত ব্যক্তিরই পাঠ করা উচিত।"

শিক্ষাপ্রচারকল্পে রাজ-বিধির প্রবর্ত্তন—আকবরের শিক্ষানীতি

আকবর সাহ সংস্কৃত শিক্ষার কিরূপ পক্ষপাতী ছিলেন, তাহার পরিচয় স্বরূপ নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি কয়েকটি উদ্ধৃত হইল—"যাহারা সংস্কৃত শিক্ষায় অভিলাষী, তাহাদের কর্ত্তব্য প্রথমে ব্যাকরণ পাঠ করা। তৎপরে যথাক্রমে ন্যায়, বেদান্ত ও পাতঞ্জল দর্শন পাঠ। সংস্কৃত পাঠে কাহারও অবজ্ঞা করা উচিত নহে, কারণ কালধর্ম্মে আজকাল সংস্কৃত-প্রচলন আমাদের রাজ্যে যথেষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।"

আকবরের সংস্কৃত-শিক্ষানুরাগ



# চতুর্থ স্তবক।

## প্রবন্ধ-পরিচয়।

### ভ্রাতৃদ্রোহ ও ভ্রাতৃস্নেহ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এই প্রবন্ধ 'রাজর্ষি' নামক গ্রন্থের দশম পরিচ্ছেদ হইতে সঙ্কলিত। ইহাতে প্রেম ও ক্ষমার অবতারস্বরূপ ভ্রাতৃস্নেহ-পরায়ণ উদারহৃদয় মহারাজা গোবিন্দমাণিক্য ও ভ্রাতৃদ্রোহরত নক্ষত্ররায়ের চরিত্র অপূর্ব্ব চরিত্রাঙ্কনীপ্রতিভাসম্পন্ন, শব্দশিল্পী কবিবরের তুলিকাস্পর্শে ভাব-বৈচিত্র্যে বিকশিত হইয়াছে।

### ঊর্ম্মিলা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এই সন্দর্ভটী ১৩০৭ সালের জ্যৈষ্ঠের 'ভারতী'তে প্রকাশিত 'কাব্যের উপেক্ষিতা' শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত। ইহাতে চির-উপেক্ষিতা, সর্ব্বসুখবঞ্চিতা, বেদনাবিধুরা, অতৃপ্তপ্রেমশালিনী ঊর্ম্মিলার অম্লান-মধুর চরিতকথা অপূর্ব্ব শক্তিশালী কবির চিত্তদ্রাবী করুণায় অভিষিক্ত বর্ণনা-মাধুর্য্যে সাতিশয় হৃদয়স্পর্শী হইয়াছে।

### রাণী ভবানী—অক্ষয়কুমার মৈত্র।

এই প্রবন্ধ ১৩০৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'সাহিত্যে' প্রকাশিত 'রাণী ভবানী' শীর্ষক সন্দর্ভ হইতে সঙ্কলিত। ইহাতে পুণ্যশীলা রাণীর বিবিধ কীর্ত্তি ও সদনুষ্ঠানের একটী মনোরম চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

### মঙ্গলগ্রহের জীব—জগদানন্দ রায়।

এই প্রবন্ধ ১৩০৫ সালের বৈশাখের 'সাহিত্য' হইতে সঙ্কলিত। ইহাতে মঙ্গলগ্রহে জীববাসের সম্ভাব্যতা আলোচিত হইয়াছে।

### বোম্বাই—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এই প্রবন্ধ ১৩০১ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'সাধনা'য় প্রকাশিত 'বোম্বায়ের রাজপথে' শীর্ষক সন্দর্ভ হইতে সঙ্কলিত। ইহা বর্ণনা-বৈচিত্র্যে সরস ও চিত্তহারী হইয়াছে।

### রোশনীবাগ—নিখিলনাথ রায়।

এই প্রবন্ধ 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' হইতে সঙ্কলিত। ইহাতে রোশনীবাগ ও ফর্হাবাগের এবং নবাব সুজাউদ্দীনের একটি মনোহর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

## অশোকের কলিঙ্গ-বিজয়—চারুচন্দ্র বসু।

এই প্রবন্ধ 'অশোক' নামক গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায় হইতে গৃহীত হইয়াছে। কলিঙ্গ যুদ্ধে অসংখ্য মানবের প্রাণনাশের দৃশ্য দর্শনে মহামনা অশোকের হৃদয়ে যে অনুতাপানল প্রজ্জ্বলিত ও জীবনে যে মহান্ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাই হৃদয়স্পর্শী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

## জাহাঙ্গীরের প্রতিশ্রুতি পালন ও ধর্ম্মোপদেশ— কুমুদিনী বসু।

এই প্রবন্ধ 'জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী' নামক গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত। ইহাতে সম্রাট জাহাঙ্গীরের কতিপয় উপদেশ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

## প্রার্থনা—শিবনাথ শাস্ত্রী।

# ভ্রাতৃদ্রোহ ও ভ্রাতৃস্নেহ।

[ এই আখ্যায়িকাটি ভুবনবিশ্রুত অমর কবি রবীন্দ্র নাথের 'রাজর্ষি নামক গ্রন্থের দশম পরিচ্ছেদের অন্তর্নিবিষ্ট। ত্রিপুরার মহারাজা গোবিন্দ মাণিক্যের স্নেহভাগিনী হাসি নাম্নী এক ক্ষুদ্র বালিকা ত্রিপুরার ভুবনেশ্বরীমন্দির-প্রান্তবাহিনী গোমতীর মর্ম্মর-মণ্ডিত ঘাটের সোপানে বলির রক্ত-চিহ্ন-দর্শনে ভীত ও ব্যথিত হইয়া সযত্নে সেই শোণিত-রেখা প্রক্ষালন করে। কিন্তু গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জ্বর-বিকার রোগে আক্রান্ত হয়। সেই মরণোন্মুখী বালিকার প্রলাপোক্তিতে সেই রক্তপাতের কথা শ্রবণে গোবিন্দ মাণিক্য মর্ম্মাহত হইয়া ভুবনেশ্বরী মন্দিরে বলিদান রহিত করেন। মন্দিরের পুরোহিত রঘুপতি ইহাতে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নক্ষত্র রায়কে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে থাকেন। নক্ষত্র রায় ও রঘুপতির প্ররোচনায় ভ্রাতৃদ্রোহে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু করুণাবতার উদারহৃদয় রাজর্ষি গোবিন্দ মাণিক্য বিদ্বেষ-বিষপূর্ণ ভ্রাতৃহৃদয় ক্ষমা ও স্নেহের অমৃতধারায় অভিষিক্ত করিয়া ভ্রাতৃত্বের পবিত্র বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াস করেন। বর্ত্তমান আখ্যায়িকায় এই দেবপ্রকৃতি নরপতির উদার ভ্রাতৃস্নেহের এক অত্যুজ্জ্বল চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। ]

*নক্ষত্ররায়ের রাজসভায় অনুপস্থিতি—গোবিন্দ মাণিক্যের নক্ষত্ররায়-সমীপে গমন ও প্রশ্ন*

মহারাজ নিয়মিত রাজকার্য্য সমাপন করিলেন। প্রাতঃকালের সূর্য্যালোক আচ্ছন্ন হইয়া গেছে। মেঘের ছায়ায় দিন আবার অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। মহারাজ অত্যন্ত বিমনা আছেন। অন্যদিন রাজসভায় নক্ষত্র রায় উপস্থিত থাকিতেন, আজ তিনি উপস্থিত ছিলেননা। রাজা তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, তিনি ওজর করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, তাঁহার শরীর অসুস্থ। রাজা স্বয়ং নক্ষত্র রায়ের কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নক্ষত্র মুখ তুলিয়া রাজার মুখের দিকে চাহিলেননা। একখানা লিখিত কাগজ লইয়া

কাজে ব্যস্ত আছেন এমনি ভাণ করিলেন। রাজা বলিলেন, "নক্ষত্র, তোমার কি অসুখ করিয়াছে?"

নক্ষত্ররায়ের উত্তর

নক্ষত্র কাগজের এপিঠ ওপিঠ উল্টাইয়া হাতের অঙ্গুরী নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "অসুখ? না, অসুখ ঠিক নয়—এই, একটুখানি কাজ ছিল—হাঁ, হাঁ, অসুখ হয়েছিল—কতকটা অসুখের মতন বটে।"

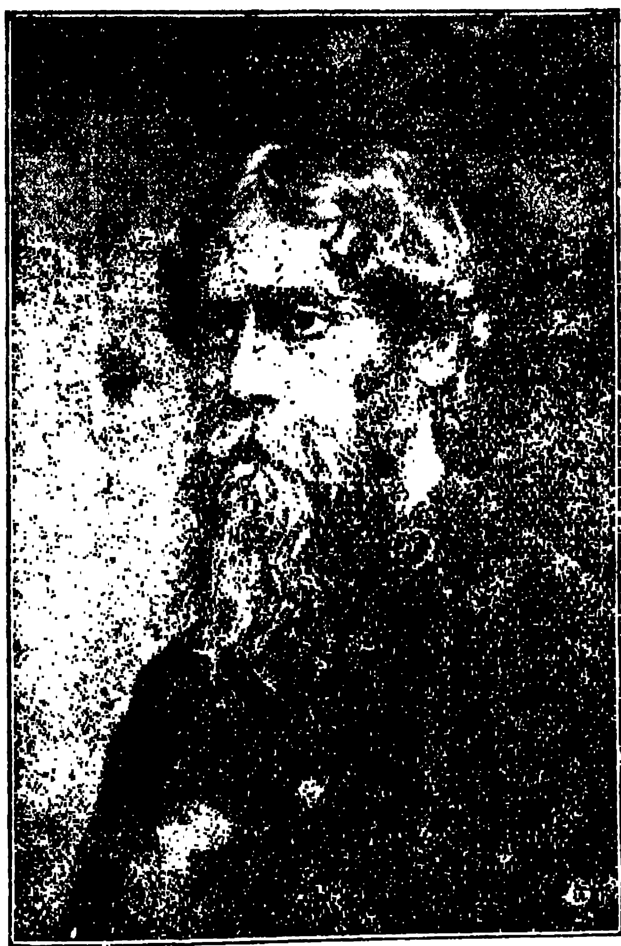
নক্ষত্র রায় নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন, গোবিন্দ মাণিক্য অতিশয় বিষণ্ণ মুখে নক্ষত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি ভাবিতে

নক্ষত্রের মনোভাব—গোবিন্দ মাণিক্যের ভ্রাতৃদ্বেষ বিষয়ে চিন্তা

লাগিলেন—হায়, হায়, স্নেহের নীড়ের মধ্যেও হিংসা ঢুকিয়াছে, সে সাপের মত লুকাইতে চায়, মুখ দেখাইতে চায়না। আমাদের অরণ্যে কি হিংস্র পশু যথেষ্ট নাই, শেষে কি মানুষ ও মানুষকে ভয় করিবে, ভাই ও ভাইয়ের পাশে গিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে বসিতে পাইবেনা? এই আমার ভাই, ইহার সহিত প্রতিদিন একগৃহে বাস করি, একাসনে বসিয়া থাকি, হাসি মুখে কথা কই—এ ও আমার পাশে বসিয়া মনের মধ্যে ছুরি শানাইতেছে! গোবিন্দ মাণিক্যের নিকট তখন সংসার হিংস্রজন্তুপূর্ণ অরণ্যের মত বোধ হইতে লাগিল। ঘন অন্ধকারের মধ্যে কেবল চারিদিকে দন্ত ও নখরের ছটা দেখিতে পাইলেন। প্রভাত-আকাশে গোবিন্দ মাণিক্য যে প্রেমমুখচ্ছবি দেখিয়াছিলেন, তাহা কোথায় মিলাইয়া গেল।

রাজার গোমতীতীরে ভ্রমণের প্রস্তাব

উঠিয়া দাঁড়াইয়া মহারাজ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "নক্ষত্র, আজ অপরাহ্নে গোমতী-তীরের নির্জ্জন অরণ্যে আমরা দুই জনে বেড়াইতে যাইব।"



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাজার এই গম্ভীর আদেশবাণীর বিরুদ্ধে নক্ষত্রের মুখে কথা সরিলনা, কিন্তু সংশয়ে ও আশঙ্কায় তাঁহার মন আকুল হইয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল—মহারাজ এতক্ষণ নীরবে দুই চক্ষু তাঁহার মনের দিকে নিবিষ্ট করিয়া বসিয়াছিলেন—যেখানে অন্ধকার গর্ত্তের মধ্যে যে ভাবনাগুলো কীটের মত কিল্ বিল্ করিতেছিল, সেগুলো যেন সহসা আলো দেখিয়া অস্থির হইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ভয়ে ভয়ে নক্ষত্ররায় রাজার মুখের দিকে একবার চাহিলেন—দেখিলেন, তাঁহার মুখে কেবল সুগভীর বিষণ্ণ শান্তির ভাব, সেখানে রোষের রেখা মাত্র নাই। মানব-হৃদয়ের কঠিন নিষ্ঠুরতা দেখিয়া কেবল সুগভীর শোক তাঁহার হৃদয়ে বিরাজ করিতেছিল।

নক্ষত্ররায়ের সংশয় ও আশঙ্কা—রাজার অন্তর্দৃষ্টি ও নক্ষত্রের সুগুপ্ত মনোভাবের আবিষ্কার

বেলা পড়িয়া আসিল। তখনও মেঘ করিয়া আছে। নক্ষত্ররায়কে সঙ্গে লইয়া মহারাজ পদব্রজে অরণ্যের দিকে চলিলেন। এখনও সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব আছে, কিন্তু মেঘের অন্ধকারে সন্ধ্যা বলিয়া ভ্রম হইতেছে—কাকেরা অরণ্যের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া অবিশ্রাম চীৎকার করিতেছে—কিন্তু দুই একটা চিল এখনও আকাশে সাঁতার দিতেছে। দুই ভাই যখন নির্জ্জন বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন নক্ষত্র রায়ের গা ছম্ ছম্ করিতে লাগিল। বড় বড় প্রাচীন গাছ জটলা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—তাহারা একটি কথা কহেনা, কিন্তু স্থির হইয়া যেন কীটের পদশব্দটুকু পর্য্যন্তও শোনে, তাহারা কেবল নিজের ছায়ার দিকে, তলস্থিত অন্ধকারের দিকে, অনিমেষনেত্রে চাহিয়া থাকে। অরণ্যে সেই জটিল রহস্যের

দিবাশেষে নিস্তব্ধ আরণ্য-প্রকৃতির দৃশ্য—নক্ষত্ররায়ের মানসিক অবস্থা—সন্দেহ ও ভয়

ভিতরে পদক্ষেপ করিতে নক্ষত্র রায়ের পা যেন আর উঠেনা—চারিদিকে সুগভীর নিস্তব্ধতার ভ্রূকুটি দেখিয়া হৃৎকম্প উপস্থিত হইতে লাগিল। নক্ষত্র রায়ের অত্যন্ত সন্দেহ ও ভয় জন্মিল। ভীষণ অদৃষ্টের মত নীরব রাজা এই সন্ধ্যাকালে এই পৃথিবীর অন্তরাল দিয়া তাঁহাকে কোথায় লইয়া যাইতেছেন, কিছুই ঠাহর পাইলেননা। নিশ্চয় মনে করিলেন, রাজার কাছে ধরা পড়িয়াছেন—এবং গুরুতর শাস্তি দিবার জন্যই রাজা তাঁহাকে এই অরণ্যের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছেন। নক্ষত্ররায় ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইতে পারিলে বাঁচেন, কিন্তু মনে হইল কে যেন তাঁহার পা বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে। কিছুতেই আর পরিত্রাণ নাই।

জলাশয়-প্রান্তে গতিরোধ

অরণ্যের মধ্যস্থলে কতকটা ফাঁকা। একটি স্বাভাবিক জলাশয়ের মত আছে, বর্ষাকালে তাহা জলে পরিপূর্ণ। সেই জলাশয়ের ধারে সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রাজা বলিলেন, "দাঁড়াও।"

নক্ষত্ররায়ের মানসিক অবস্থা

নক্ষত্ররায় চমকিয়া দাঁড়াইলেন। মনে হইল, রাজার আদেশ শুনিয়া সেই মুহূর্ত্তে কালের স্রোত যেন বন্ধ হইল—সেই মুহূর্ত্তেই যেন অরণ্যের বৃক্ষগুলি যে যেখানে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল—নীচ হইতে ধরণী এবং উপর হইতে আকাশ যেন নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। কাকের কোলাহল থামিয়া গেছে, বনের মধ্যে একটি শব্দ নাই—কেবল সেই "দাঁড়াও" শব্দ অনেকক্ষণ ধরিয়া যেন গম্ গম্ করিতে লাগিল—সেই "দাঁড়াও" শব্দ যেন তড়িৎ-প্রবাহের মত বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে, শাখা হইতে প্রশাখায় প্রবাহিত হইতে লাগিল, অরণ্যের প্রত্যেক পাতাটা যেন সেই শব্দের কম্পনে রী রী করিতে লাগিল। নক্ষত্ররায়ও যেন গাছের মতই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন।

রাজার প্রশ্ন

তখন নক্ষত্ররায়ের মুখের দিকে মর্ম্মভেদী স্থির বিষণ্ন দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া প্রশান্ত গম্ভীর স্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন,—"নক্ষত্র, তুমি আমাকে মারিতে চাও?"

নক্ষত্রের নিস্পন্দভাব

নক্ষত্র বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন—উত্তর দিবার চেষ্টাও করিতে পারিলেননা।

রাজা কহিলেন, কেন মারিবে ভাই? রাজ্যের লোভে? তুমি কি মনে কর, রাজ্য কেবল সোণার সিংহাসন, হীরার মুকুট ও রাজছত্র? এই রাজদণ্ডের ভার কত, তাহা জান? শত সহস্র লোকের চিন্তা এই হীরার মুকুট দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছি। রাজ্য পাইতে চাও ত সহস্র লোকের দুঃখকে আপনার দুঃখ বলিয়া গ্রহণ কর, সহস্র লোকের বিপদ্‌কে আপনার বিপদ বলিয়া বরণ কর, সহস্র লোকের দারিদ্র্যকে আপনার দারিদ্র্য বলিয়া স্কন্ধে বহন কর—এই যে করে, সেই রাজা, সে পর্ণকুটীরেই থাক্ আর প্রাসাদেই থাক্। যে ব্যক্তি সকল লোককে আপনার বলিয়া মনে করিতে পারে, সকল লোক ত তাহারই! তাহার ঐশ্বর্য্য, তাহার গৌরব, তাহার সুখ, অক্ষৌহিণী সৈন্য আসিয়া কাড়িতে পারেনা। পৃথিবীর দুঃখ হরণ যে করে, সেই পৃথিবীর রাজা, পৃথিবীর অর্থ ও রক্ত শোষণ যে করে, সে ত দস্যু—সহস্র অভাগার অশ্রুজল তাহার মস্তকে অহর্নিশ বর্ষিত হইতেছে, সেই অভিশাপধারা হইতে কোন রাজছত্র তাহাকে রক্ষা করিতে পারেনা। তাহার প্রচুর রাজভোগের মধ্যে শত শত উপবাসীর ক্ষুধা লুকাইয়া আছে, অনাথের দারিদ্র্য গলাইয়া যে সোণার অলঙ্কার করিয়া পরে, তাহার ভূমি-বিস্তৃত রাজ-বস্ত্রের মধ্যে শত শত শীতাতুরের মলিন ছিন্নকন্থা। রাজাকে বধ করিয়া রাজত্ব মেলেনা ভাই—পৃথিবীকে বশ করিয়া রাজা হইতে হয়!"

রাজার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য—

গোবিন্দমাণিক্য থামিলেন। নক্ষত্ররায় মাথা নত করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

মহারাজ থাপ হইতে তরবারি খুলিলেন। নক্ষত্ররায়ের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন—"ভাই, এখানে লোক নাই, সাক্ষ্য নাই, কেহ নাই—ভাইয়ের বক্ষে ভাই যদি ছুরি মারিতে চায়, তবে তাহার স্থান এই, সময় এই—এখানে কেহ তোমাকে নিবারণ করিবেনা, কেহ তোমাকে নিন্দা করিবেনা। তোমার শিরায় আর আমার শিরায় একই রক্ত বহিতেছে, একই পিতা, একই পিতামহের রক্ত—তুমি সেই রক্তপাত করিতে চাও, কিন্তু মনুষ্যের আবাসস্থলে করিও না। কারণ, যেখানে এই রক্তের বিন্দু পড়িবে, সেইখানেই অলক্ষ্যে ভ্রাতৃত্বের পবিত্র বন্ধন শিথিল হইয়া যাইবে। পাপের একটি বীজ যেখানে পড়ে, সেখানে দেখিতে দেখিতে গোপনে কেমন করিয়া সহস্র বৃক্ষ জন্মায়, কেমন করিয়া অল্পে অল্পে সুশোভন মানব-সমাজ অরণ্যে পরিণত হইয়া যায়, তাহা কেহ জানিতে পারেনা। অতএব নগরে, গ্রামে,—যেখানে নিশ্চিন্ত চিত্তে পরমস্নেহে ভাইয়ে ভাইয়ে গলাগলি করিয়া আছে, সেই ভাইদের নীড়ের মধ্যে ভাইয়ের রক্তপাত করিওনা। এই জন্য তোমাকে আজ অরণ্যে ডাকিয়া আনিয়াছি!"

নক্ষত্ররায়কে ভ্রাতৃ-হত্যার জন্য রাজার অনুরোধ—লোকালয়ে ভ্রাতৃ-শোণিত-পাতের কুফল

এই বলিয়া রাজা নক্ষত্ররায়ের হাতে তরবারি দিলেন। নক্ষত্ররায়ের হাত হইতে তরবারি ভূমিতে পড়িয়া গেল। নক্ষত্ররায় দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "দাদা, আমি দোষী নই—একথা আমার মনে কখনও উদয় হয় নাই।"

নক্ষত্ররায়ের রোদন

রাজা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া বলিলেন,—"আমি তাহা জানি—তুমি কি কখনও আমাকে আঘাত করিতে পার?—তোমাকে পাঁচজনে মন্দ পরামর্শ দিয়াছে।"

রাজার স্নেহালিঙ্গন ও ভ্রাতার প্রতি বিশ্বাসের ভাব

নক্ষত্ররায় বলিলেন,—"আমাকে রঘুপতি কেবল এই উপদেশ দিতেছে।"

রাজা বলিলেন,—"রঘুপতির কাছ হইতে দূরে থাকিও।"

নক্ষত্ররায় বলিল,—"কোথায় যাইব বলিয়া দিন্। আমি এখানে থাকিতে চাইনা। আমি এখান হইতে—রঘুপতির কাছ হইতে পলাইতে চাই।"

রঘুপতির হস্ত হইতে নিস্তার-লাভের প্রয়াস

রাজা বলিলেন,—"তুমি আমারই কাছে থাক,—আর কোথাও যাইতে হবেনা,—রঘুপতি তোমার কি করিবে?"

রাজার আশ্বাস

নক্ষত্ররায় রাজার হাত দৃঢ় করিয়া ধরিলেন, যেন রঘুপতি তাঁহাকে টানিয়া লইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে।

রাজার হস্ত ধারণ



# উর্ম্মিলা।

কবি তাঁহার কল্পনা-উৎসের যত করুণাবারি সমস্তই কেবল জনক-তনয়ার পুণ্য অভিষেকে নিঃশেষ করিয়াছেন। কিন্তু আর একটি যে ম্লানমুখী, ঐহিকের সর্ব্বসুখবঞ্চিতা রাজবধূ সীতাদেবীর ছায়াতলে অবগুণ্ঠিতা হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, কবি-কমণ্ডলু হইতে একবিন্দু অভিষেকবারি ও কেন তাঁহার চিরদুঃখাভিতপ্ত নম্রললাটে সিঞ্চিত হইলনা! হায়! অব্যক্তবেদনা দেবি উর্ম্মিলা, তুমি প্রত্যুষের তারার মত মহাকাব্যের সুমেরুশিখরে একবার মাত্র উদয় হইয়াছিলে, তারপরে অরুণালোকে আর তোমাকে দেখা গেলনা! কোথায় তোমার উদয়াচল, কোথায় তোমার অস্তশিখরী, তাহা প্রশ্ন করিতেও সকলে বিস্মৃত হইল।

উর্ম্মিলার প্রতি কবি বাল্মীকির উপেক্ষা

উর্ম্মিলাকে কেবল আমরা দেখিলাম বধূবেশে, বিদেহনগরীর বিবাহ-সভায়। তারপরে যখন হইতে সে রঘুরাজকুলের সুবিপুল অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন হইতে আর তাহাকে একদিনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয়না। সেই তাহার বিবাহসভার বধূবেশের ছবিটিই মনে রহিয়া গেল। উর্ম্মিলা চিরবধূ—নির্ব্বাক-কুণ্ঠিতা নিঃশব্দচারিণী। ভবভূতির কাব্যে ও তাহার ছবিটুকু মুহূর্ত্তের জন্য প্রকাশিত হইয়াছিল; সীতা কেবল সস্নেহকৌতুকে একটিবারমাত্র তাহার উপরে তর্জ্জনী রাখিয়া দেবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! ইনি কে?" লক্ষ্মণ লজ্জিত হাস্যে মনে মনে কহিলেন, "ওহো, উর্ম্মিলার কথা আর্য্যা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ লজ্জায় সে ছবি ঢাকিয়া ফেলিলেন; তাহার পর রামচরিতের এত বিচিত্র সুখ-দুঃখ-

নববধূবেশে উর্ম্মিলা—আলেখ্য দর্শনকালে উর্ম্মিলার উল্লেখ

চিত্রশ্রেণীর মধ্যে আর একটিবার ও কাহারও কৌতূহলী অঙ্গুলী এই ছবিটির উপরে পড়িলনা। সেত কেবল বধূ উর্ম্মিলা মাত্র!

তরুণ শুভ্রভালে যে দিন প্রথম সিন্দূরবিন্দুটি পরিয়াছিলেন, উর্ম্মিলা চিরদিনই সেই দিনকার নববধূ। কিন্তু রামের অভিষেক-মঙ্গলাচরণের আয়োজনে যে দিন অন্তঃপুরিকাগণ ব্যাপৃত ছিল, সে দিন এই বধূটিও কি সীমন্তের উপর অর্দ্ধাবগুণ্ঠন টানিয়া রঘুকুললক্ষ্মীদিগের সহিত প্রসন্ন কল্যাণমুখে মাঙ্গল্যরচনায় নিরতিশয় ব্যস্ত ছিলনা? আর যে দিন অযোধ্যা অন্ধকার করিয়া দুই কিশোর রাজভ্রাতা সীতাদেবীকে সঙ্গে লইয়া তপস্বীবেশে পথে বাহির হইলেন, সে দিন বধূ উর্ম্মিলা রাজহর্ম্ম্যের কোন্ নিভৃত শয়নকক্ষে ধূলিশয্যায় বৃন্তচ্যুত মুকুলটির মত লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা কি কেহ জানে? সেদিনকার সেই বিশ্বব্যাপী বিলাপের মধ্যে এই বিদীর্য্যমান ক্ষুদ্র কোমল হৃদয়ের অসহ্য শোক কে দেখিয়াছিল? যে ঋষি-কবি ক্রৌঞ্চ-বিরহিণীর বৈধব্য-দুঃখ মুহূর্ত্তের জন্য সহ্য করিতে পারেন নাই, তিনি ও একবার চাহিয়া দেখিলেননা।

উপেক্ষিতা উর্ম্মিলা—উর্ম্মিলার সুখ-দুঃখ—কবির সহানুভূতির অভাব

লক্ষ্মণ রামের জন্য সর্ব্বপ্রকারে আত্মবিলোপ সাধন করিয়াছিলেন, সে গৌরব ভারতবর্ষের গৃহে গৃহে আজিও ঘোষিত হইতেছে, কিন্তু সীতার জন্য উর্ম্মিলার আত্মবিলোপ কেবল সংসারে নহে, কাব্যে ও। লক্ষ্মণ তাঁহার দেবতাযুগলের জন্য কেবল নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, উর্ম্মিলা নিজের চেয়ে অধিক নিজের স্বামীকে দান করিয়াছিলেন। সে কথা কাব্যেও লেখা হইলনা। সীতার অশ্রু-জলে উর্ম্মিলা একেবারে মুছিয়া গেল।

লক্ষ্মণ ও উর্ম্মিলার আত্মবিলোপ—উভয়ের তুলনা

লক্ষ্মণ ত বারো বৎসর ধরিয়া উপাস্য প্রিয় জনের প্রিয়কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। নারীজীবনের সেই বারোটি শ্রেষ্ঠ বৎসর উর্ম্মিলার কেমন করিয়া কাটিয়াছিল? স্বামীর সহিত যখন প্রথমতম মধুরতম পরিচয়ের আরম্ভ সময়, সেই মুহূর্ত্তে লক্ষ্মণ সীতাদেবীর রক্তচরণক্ষেপের প্রতি নত দৃষ্টি রাখিয়া বনে গমন করিলেন;—যখন ফিরিলেন তখন নববধূর সুচির প্রণয়ালোক-বঞ্চিত হৃদয়ে কি আর সেই নবীনতা ছিল? পাছে সীতার সহিত উর্ম্মিলার পরম দুঃখ কেহ তুলনা করে, তাই কি কবি সীতার স্বর্ণ-মন্দির হইতে এই শোকোজ্জ্বলা মহাদুঃখিনীকে একেবারে বাহির করিয়া দিয়াছেন, জানকীর পাদপীঠপার্শ্বেও বসাইতে সাহস করেন নাই।

উর্ম্মিলার সুদীর্ঘ বিরহ-যাপন—উর্ম্মিলার প্রতি কবির উপেক্ষার কারণ সম্বন্ধে অনুমান





অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

# রাণী ভবানী।

বাঙ্গালীর ইতিহাসে রাণী ভবানীর ন্যায় দেবী-চরিত্র বড়ই দুর্ল্লভ। তাঁহার জীবনলীলা যখন শেষ হইয়া আসিতেছিল, সেই সময়ে আর একজন হিন্দুমহিলা ধীরে ধীরে প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়া উঠিতেছিলেন। তীর্থযাত্রী হিন্দু নরনারী গয়াধামের দেবমন্দিরদ্বারে ভক্তি-বিস্ময়ে প্রণিপাত করিবার সময়ে, এখনও সেই পবিত্রব্রতধারিণী অহল্যারাণীর কথা স্মরণ করিয়া সাধুবাদ প্রদান করিয়া থাকেন। একজন চিন্তাশীল লেখক ইঁহার কীর্ত্তিকলাপ লক্ষ্য করিয়া যে সকল সমালোচনা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, রাণী ভবানীর সম্বন্ধেও তাহার প্রত্যেক কথাই প্রযুক্ত হইতে পারে।

রাণী ভবানী ও অহল্যা বাই

তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, "এই হিন্দুমহিলা যেরূপ চরিত্রগৌরব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা পৃথিবীর সকল যুগ ও সকল দেশকেই গৌরব-মণ্ডিত করিতে পারিত। সত্য বটে, সীতা-সাবিত্রী অথবা কুন্তী-দ্রৌপদী হিন্দুসমাজের সমাদর ও পূজা লাভ করিয়া চিরস্মরণীয়া হইয়াছেন; কিন্তু ইহাও সত্য যে, প্রতিভাশালী অমর কবিকুলতিলকদিগের বর্ণনা-লালিত্যের সহিত অবতারবাদের গুপ্ত বিশ্বাস মিলিত হইয়া, এই সকল হিন্দুরমণীর কীর্ত্তিকাহিনী আরও অমৃতময় করিয়া তুলিয়াছে। মহারাষ্ট্র-কুলমহিলা অহল্যারাণী দেবতা বা দেবাবতার ছিলেননা। তিনি মানুষ হইয়া যেরূপ ভাবে দেবহৃদয়ের পরিচয় প্রদান করিয়া নীরবে ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার স্বদেশীয়গণ আজিও সেই দেবী-চরিত্রের সমুজ্জ্বল চিত্রপট লোকচক্ষুর নিকট উদ্‌ঘাটন করিবার জন্য লেখনী ধারণ করেন নাই!"

রাণী ভবানী যে যুগে জন্মগ্রহণ করেন, সে যুগ মুসলমান নবাবদিগের প্রবল প্রতাপের অলৌকিক-কাহিনীপরিপূর্ণ রহস্যময় তামস-যুগ বলিয়া ইংরাজের ইতিহাসে সুপরিচিত হইলেও, সেকালে এদেশের সকল স্থানেই হিন্দু জমিদার দিগের আত্মশাসনগৌরব উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। সেই জন্য হিন্দু রীতি-নীতি, হিন্দু আচার-ব্যবহার, হিন্দু পরহিতাকাঙ্ক্ষার পবিত্র নিদর্শনগুলি কিছুমাত্র বিলুপ্ত হয় নাই। ভবানী আত্মারাম চৌধুরীর একমাত্র স্নেহময়ী দুহিতা,—আত্মারামের সৌধ-বিভূষিত সৌভাগ্যসম্পদের একমাত্র আশালতা। সুতরাং আশৈশব পরম স্নেহে লালিত পালিত ভবানীর বাল্যজীবনে পিতৃগৃহে যে সকল অনাহূত, পথশ্রান্ত, বিপন্ন পথিকগণ প্রতিদিন অকাতরে অন্নপানীয় পাইত, পিতৃগৃহের সুমার্জ্জিত দেবমন্দিরে শঙ্খঘণ্টানিনাদমুখরিত মন্ত্রোচ্চারণে যে সকল দেবদেবীর সেবাপূজা প্রতিদিন পরম সমারোহে নির্ব্বাহিত হইত, তাহা বালিকাহৃদয়ে এমন চিরস্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল যে, উত্তরকালে অতুল সম্পদের অধিকারিণী হইয়া, রাণী ভবানী পিতৃগৃহের ন্যায় সমগ্র বঙ্গভূমিকে সেই মহোৎসবের রসাস্বাদন করাইবার জন্য দেশে দেশে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া, পূজাব্যপদেশে অকাতরে সর্ব্বজীবে অন্নদানার্থ রাজভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন!

রাণী ভবানীর পিতৃ-আদর্শের অনুসরণ

অর্দ্ধবঙ্গাধিকারিণী দীনপালিনী রাণী ভবানী যেরূপ সগৌরবে অর্দ্ধশতাব্দীকাল রাজ্যশাসন করিয়াছেন, পরহিতাকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া স্বদেশের কল্যাণকামনায় যে সকল সদনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন, স্বধর্ম্মানুরাগের বশবর্ত্তিনী হইয়া দেশে দেশে যে সকল দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, লোকহিতব্রতে অগ্রসর হইয়া মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিয়া যে

রাণী ভবানীর সদনুষ্ঠান

সকল অক্ষয় কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ কাল সহকারে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে; কিন্তু এখনও যাহা সংগ্রহ করা সম্ভব, তাহাও এত বহুবিস্তৃত যে, তাহাতেই একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়া যায়।

রাণীভবানীর জলাশয়-খনন ও জলদানব্রত

বাঙ্গালাদেশে নদনদী খালবিলের অভাব নাই। বরং বর্ষাকালের অপরিসীম জলপ্লাবনে অধিকাংশ স্থানেই লোকের বাড়ীঘর, পথঘাট জলমগ্ন হইয়া যায়। কিন্তু এ দেশের এমনই অদৃষ্টবিড়ম্বনা যে, সেই সকল পল্লীতে পল্লীতে গ্রীষ্মকালের নিদারুণ জলকষ্টে পল্লীবাসিগণ হাহাকার করিতে থাকে। বাঙ্গালাদেশ গ্রীষ্মপ্রধানদেশ; বাঙ্গালীজাতি কৃষি-প্রধানজাতি;—জল ভিন্ন বাঙ্গালীর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা যে কত দূর অসম্ভব, তাহা বাঙ্গালী ভিন্ন আর কেহ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে না। বাঙ্গালীর জলদৈন্য দূর করিবার জন্য যাঁহারা মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালীর নিকট তাঁহাদের পুণ্য নাম চিরস্মরণীয় হইয়াছে। রাণী ভবানীর যে সকল পুণ্যকীর্ত্তি এখনও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই, তন্মধ্যে তাঁহার জলাশয়গুলিই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অনেক দেবমন্দিরের উচ্চ চূড়া ধূলি-বিলুণ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহার সংস্থাপিত অনেক অতিথিশালার ভিত্তিমূল পর্য্যন্তও তিরোহিত হইয়া গিয়াছে, তাঁহার বহুব্যয়নির্ম্মিত অনেক রাজপথ কণ্টকবনে সমাচ্ছন্ন হওয়ায় লোকচলাচল রহিত হইয়া গিয়াছে;—কিন্তু তিনি যে সকল দীর্ঘিকা ও সরোবর খনন করাইয়া দিয়া দরিদ্রের জলকষ্ট নিবারণ করিয়াছিলেন, তাহার স্বচ্ছ সলিলে তাঁহার পুণ্যকীর্ত্তি এখনও প্রতিবিম্বিত হইতেছে! তিনি কোথায় কত সরোবর খনন করাইয়া দিয়াছিলেন, পরোক্ষভাবে কত স্থানে জলাশয়-খননের উৎসাহদান করিয়াছিলেন, এখন

আর তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা সহজ নহে। একবার দুর্ভিক্ষ-সময়ে রাঢ়দেশের দুর্দ্দশার অবস্থা স্বচক্ষে পরিদর্শন করিবার জন্য স্বদেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রীষ্মকালের প্রখর রৌদ্রতাপে অশ্বারোহণে দীর্ঘপথ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, যেখানে এক একটি প্রসন্নসলিলা বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা দেখিয়া জলদাতার নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সেখানেই লোকে দুই হাত তুলিয়া রাণী ভবানীর নাম করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছে। কেহ যদি এখনও পুরাতন রাজসাহী রাজ্যের সকল স্থান পরিভ্রমণ করিতে পারেন, তবে এইরূপ শত শত জলদান-ব্রতের কীর্ত্তিস্তম্ভে রাণী ভবানীর সহৃদয় শাসন-নীতির পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন।

রাণীভবানীর পথ ও পান্থশালা নির্ম্মাণ

আজকাল এ দেশে গমনাগমনের পথ সহজ হইয়াছে। সেকালে প্রধান প্রধান স্থানে যাতায়াত করিবার সুবিধা ছিলনা। যে দুই চারিটি পথ ঘাট ছিল, তাহাতেও লোকে নিঃশঙ্কচিত্তে গমনাগমন করিতে সাহস পাইতনা। দূর-দেশে গমন করিতে হইলে হয় পথক্লেশে, না হয় দস্যুহস্তে, শীঘ্রই ভ্রমণকার্য্য সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিত। পথিমধ্যে পথিকদিগের বিশ্রামের জন্য কোনরূপ আশ্রয়স্থান ছিলনা। ইহাতে বাণিজ্য-ব্যবসায়ের যেরূপ ক্ষতি হইত, তীর্থযাত্রীদিগকে ততোধিক বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হইত। নবাব মুরশিদকুলী খাঁ বাহাদুর রাজধানী মুরশিদাবাদ হইতে হুগলী পর্য্যন্ত রাজপথপার্শ্বে স্থানে স্থানে অনেকগুলি প্রহরিমন্দির ও পান্থশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। রাণী ভবানীও তদনুরূপ কতকগুলি রাজপথ ও পান্থশালা নির্ম্মাণ করিয়া তীর্থযাত্রী হিন্দুদিগের তীর্থক্লেশ অনেক পরিমাণে দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজসাহী-প্রদেশে রাণী ভবানীর একটি রাজপথ ও সেতু এখনও

বর্ত্তমান আছে; তাহার নাম "ভবানী জাঙ্গাল"। এই পথের বিশেষত্ব এই যে, ইহার স্থানে স্থানে জলাশয় এবং জলাশয়তীরে পথিপার্শ্বে প্রস্তর-নির্ম্মিত ভোজনপাত্র, পানপাত্র ও রন্ধনস্থান নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে; পথিকগণ অনায়াসে সেখানে আসিয়া স্নানাহার সম্পাদন করিতে পারিতেন। দেখিলেই মনে হয় যে, সেই পুরাতন রাজপথগাত্রে এখনও যেন করুণা-রূপিণী রাণী ভবানীর সরল সুন্দর সৌম্যমূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।



## মঙ্গলগ্রহের জীব।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে অতি অল্পকাল মধ্যে মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানা গিয়াছে। দূরবীক্ষণদ্বারা মঙ্গল গ্রহটি পর্য্যবেক্ষণ করিলে, ইহার স্থানে স্থানে একপ্রকার কৃষ্ণচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, এবং মেরুদ্বয়ের প্রান্তদেশে উজ্জ্বল শ্বেত আলোক দৃষ্টিগোচর হয়। বৃহৎ দূরবীক্ষণ দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, মঙ্গলপৃষ্ঠস্থ আরও অনেক ব্যাপার সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পরীক্ষা করিলে, বহুসংখ্যক সরলরেখা দ্বারা সমগ্র গ্রহটি নানা আকারের ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ প্রভৃতি জ্যামিতিকক্ষেত্রে বিভক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

মঙ্গলগ্রহের অবস্থা।

মঙ্গলের এই অদ্ভুত প্রাকৃতিক দৃশ্য ও আকারাদি বিষয়ে অনেক জ্যোতির্ব্বিদ অনেক কথা বলিতেছেন। মঙ্গলের আধুনিক অবস্থা ও জীববাসোপযোগিতা সম্বন্ধে বিজ্ঞ পণ্ডিতগণের নানা অনুমান, ইতিমধ্যেই প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অনেকে জীববাসোপযোগী অনেক পদার্থ মঙ্গলগ্রহে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন বলিয়া প্রচার করিয়াছেন; পূর্ব্বে যে মঙ্গলগোলকস্থ শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ চিহ্নগুলির কথা বলা হইয়াছে,—ইঁহাদের মতে তাহা নীলবর্ণ জলরাশি ও মেরুদেশস্থ সুবিস্তৃত তুষারস্তূপ ব্যতীত আর কিছুই নয়। গ্রহগোলকব্যাপ্ত উল্লিখিত সরলরেখাগুলির উৎপত্তিতত্ত্ব ও কয়েকজন পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন। ইহারা বলেন,—উক্ত সরলরেখাগুলি প্রাকৃতিক কারণে কিছুতেই উৎপন্ন হইতে পারেনা; সুবিন্যস্ত সরলরেখাযোগে এই প্রকার নানাবিধ জ্যামিতিক ক্ষেত্রের অঙ্কন, প্রাকৃতিক কোন কার্য্যেই কখনও

মঙ্গলের জীববাসোপযোগিতা—পণ্ডিতগণের অনুমান

দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এগুলি নিশ্চয়ই কোনও বিশেষ বুদ্ধিসম্পন্ন মঙ্গলবাসী জীবের কীর্ত্তি। মঙ্গলে পৃথিবীর ন্যায় ঝড়-বৃষ্টি ও মেঘাদির আধিক্য নাই, সেই জন্য তথায় শস্যাদি উৎপাদনের ও জীবস্থিতির নিমিত্ত কৃত্রিম নদী ও খাল ইত্যাদির বিশেষ আবশ্যক। ইহাদের মতে, মঙ্গলপৃষ্ঠ-ব্যাপ্ত রেখাগুলি, মঙ্গলবাসিগণের নিখাত সুবিন্যস্ত কৃত্রিম নদী ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারেনা।

মঙ্গলগ্রহে জীবস্থিতি ও প্রাকৃতিক অবস্থা

জীবের অস্তিত্বজ্ঞাপক এই প্রকার বিবিধ চিহ্নের আবিষ্কার করিয়া, মঙ্গলগ্রহ উৎকৃষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন জীবের বাসস্থান বলিয়া প্রায় সকলেই অনুমান করিতেছেন। মঙ্গলের তাপ-পরিমাণ প্রায় পৃথিবীর তাপের অনুরূপ, ইহার মেরুদ্বয়ে যে তুষাররাশি সঞ্চিত থাকে, এই তাপ-প্রভাবে তাহা জলীভূত হইয়া, পরে উক্ত কৃত্রিম নদী ও সমুদ্রাদি দ্বারা সমগ্র গ্রহপৃষ্ঠে সঞ্চারিত হইয়া পড়ে। মাঙ্গলিক আকাশে বায়ু ইত্যাদিরও অস্তিত্ব আছে, স্থিরীকৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহা পার্থিব বায়ুর ন্যায় ঘন নয়, কাযেই তদ্দ্বারা আকাশের বা ঋতুর কোন বৈচিত্র্যই সাধিত হয়না। মঙ্গলে একঘেয়ে চির বসন্ত সর্ব্বদাই বিদ্যমান। ঘনত্ব হিসাবে পদার্থের ভার মঙ্গলে বড় অল্প; গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে, একলক্ষমণ-ভার-বিশিষ্ট কোনও পার্থিব পদার্থ মঙ্গলে লইয়া গেলে, তাহার ভার তথায় কেবল ৩৭৬ মণ মাত্র হইয়া যায়। বলা বাহুল্য, মঙ্গলের আয়তনের ক্ষুদ্রতা ও ঘনত্বের অল্পতাই এই ভার-বৈষম্যের কারণ। কেবল কৃত্রিম খাল প্রভৃতি দেখিয়া মাঙ্গলিক জীবের অস্তিত্ব প্রথমতঃ অনেকে গ্রাহ্য করেন নাই। এখন মঙ্গলের প্রাকৃতিক অবস্থা সকলও জীবস্থিতির সম্পূর্ণ অনুকূল দেখিয়া, মঙ্গলগ্রহে জীববাসের সম্ভাব্যতা অধুনা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন।

জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ এই প্রকারে মাঙ্গলিক জীবের অস্তিত্ব প্রতিপাদিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাহাদের আকার, বুদ্ধি ও পৌরুষাদি সম্বন্ধে নির্ভুল তথ্য আবিষ্কার করিবার জন্য কয়েকজন পণ্ডিত সচেষ্ট রহিয়াছেন।

মঙ্গলগ্রহবাসিগণের বুদ্ধি ও ক্ষমতা

মঙ্গলবাসিগণ যে মনুষ্য অপেক্ষা অনেক বুদ্ধিমান ও ক্ষমতাশালী জীব, তাহা মঙ্গলপৃষ্ঠস্থ বৃহৎ বৃহৎ কৃত্রিম নদী ও খাল ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা তাঁহারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের আকৃতি ও পৌরুষাদি সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই।





জগদানন্দ রায়।



বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

# বোম্বাই।

সমুদ্রের উপকূলে বৃহৎ বোম্বাইপুরী যেন পাশ্চাত্য শিল্পীর অঙ্কিত বিস্তীর্ণ পটের উপরে প্রাচ্য উপন্যাসের একখানি মায়াচিত্র। মালাবার শৈলশিখর হইতে তরুণ শ্যামিমা নামিয়া আসিয়া নিম্নভূমির নারিকেলতরুকুঞ্জে নিঃশব্দে মিশিয়া গিয়াছে এবং এই মোহময়ী প্রকৃতির নিবিড় কুঞ্জবনমধ্য হইতে সহস্র অভ্রংলিহ প্রাসাদ-শিখররাজি উঠিয়া বোম্বায়ের রবিকরদীপ্ত সমুদ্রবেলায় একটি চিত্রাপিত রমণীয়তা অর্পণ করিয়াছে। রাজপথে বিচিত্র জনতা, এই মায়াপুরীরই রাজপথ, এবং সে জনতাও এমনি মোহকর। বিচিত্র উষ্ণীষ, বিবিধ বর্ণ, বহুবিধ বেশভূষা, নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী, সমস্ত মিলিয়া দর্শকের মনে একটি সুদূর স্বপ্নাবেশ সঞ্চারিত করিয়া দেয়, এবং এই বিচিত্রবর্ণ গতিবিধি মৃদু সন্ধ্যারুণরাগে শুধু একটি বর্ণময়ী ছায়াসমাগমের মত প্রতিভাত হয়।

বোম্বাইর প্রাকৃতিক দৃশ্য—বোম্বায়ের রাজপথে মোহকরী বিচিত্রতা

বোম্বাইপুরী পূর্ব্ব পশ্চিমের মিলনতীর্থ। ভারতলক্ষ্মী এখানে পশ্চিম সমুদ্রের তটপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়া, এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা, সমুদ্র পার হইয়া এইখানে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছে। প্রাচী এবং প্রতীচী উভয়ই এখানে উজ্জ্বল অম্লান লাবণ্যে উদ্ভাসিত। নগরী শোভা-স্বাস্থ্যে সমুজ্জ্বল, রাজপথ প্রশস্ত ও পরিষ্কার, কর্ম্মস্রোত নিত্য-প্রবাহিত, রাজপথে লৌহবর্ত্মে রথচক্র নিরন্তর ঘর্ঘরিত, এবং এই বেগবান্ পাশ্চাত্য ঐশ্বর্য্য-প্রবাহের মাঝখান দিয়া দক্ষিণ ভারতবর্ষের উজ্জ্বলবর্ণধারিণী শুচিশোভা তরণীখানি সুন্দর ভাবে ভাসিয়া চলিয়াছে।

বোম্বায়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মিলন

সভ্যতা-সঙ্গমের তীর্থতটবর্ত্তী বোম্বায়ের এই কুহক অন্যত্র দুর্লভ। ইহার মধ্যে যে একটি মোহকরী প্রাচীনতা আছে—ইহার জনতায়,

উষ্ণীষে, উৎসব-আনন্দে যে প্রাচীন সভ্যতার সজীবতা অনুভূত হয়, আর্য্যাবর্ত্তের বড় বড় সহরে কোথা ও এই প্রাচীন মোহটুকু নাই। ইহার একটি প্রধান কারণ এই যে, যে উদীয়মান শক্তিপ্রভাবে মহারাষ্ট্রীয়গণ অনতিকাল পূর্ব্বে সমস্ত ভারতবর্ষে

প্রাচীন সভ্যতার সজীবতা—বোম্বায়ে সংস্কৃত ভারতের প্রতিচ্ছবি

ক্রমশঃ আপন প্রতাপ বিকীর্ণ করিতেছিল, সেই উদ্ধত শক্তি এবং সেই জ্যোতিঃ মহারাষ্ট্র দেশে হিন্দু সমাজকে সজীব ও উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। মহারাষ্ট্রের তেজস্বী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিশুদ্ধ পৌরাণিক আদর্শ একটি সজীব আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে। বিদেশীয় উপপ্লবে সমতল উত্তর ভারত বারম্বার প্লাবিত হইয়া নবনব স্তরপাতে মিশ্রতা লাভ করিয়াছে; মহারাষ্ট্র দেশ অপেক্ষাকৃত অক্ষুব্ধ ছিল: দিল্লী মহানগরীর প্রবল আবর্ত্তবেগ দাক্ষিণাত্যে ক্ষীণতর হইয়া প্রবেশ করিত। আর একটি কারণ এই যে, কালিদাস ও ভবভূতির অমর কাব্যে দক্ষিণ ভারতবর্ষকে চিরকালের জন্য পুরাতন করিয়া রাখিয়াছে। তীর্থ বহু আছে, দেবধানীর অন্ত নাই, বর্ষে বর্ষে বহুব্যয়ে নানাস্থানে বহু উৎসব সুসম্পন্ন হয়; কিন্তু যদি কোথাও রাজপথের বিচিত্র জনতার মুখশ্রীতে একটি প্রাচীন সভ্যতা মুদ্রিত হইয়া গিয়া থাকে, ত সে বোম্বায়ে। বোম্বাই সংস্কৃত ভারতবর্ষের একখানি চারু চিত্র।

আমি বোম্বায়ের একটি মাত্র উৎসব দেখিয়াছি। তখন ভাদ্রপদ মাস, সমুদ্র বোম্বায়ের কূলে কূলে উচ্ছলিত, আকাশে ক্ষণে মেঘ, ক্ষণে রৌদ্র, এবং নবাগত শরৎ, রৌদ্র ও বৃষ্টি দিয়া মেঘে মেঘে নব নব আভা এবং বর্ণের লূতাতন্তু রচনা করে। এই মায়াচন্দ্রাতপতলে গণপতির

গণপতি-উৎসব—উৎসবের বিচিত্র দৃশ্য

মহোৎসব। সহস্র ক্ষুদ্র বৃহৎ গণপতি শিবিকারোহণে, বাহকস্কন্ধে সমুদ্রবেলায় সমাগত। দেহের বর্ণে একটি অতি মৃদু গোলাপী আভা,

পরিধানে শুভ্র বস্ত্র, কুণ্ডলীকৃতাগ্রভাগ দীর্ঘ শুণ্ড উদরপিণ্ডোপরি প্রায় লুটাইয়া পড়িয়াছে, এবং এই গজগাম্ভীর্য্যের মধ্য হইতে জ্ঞানের সরল প্রশান্ত মহিমা অনতিউজ্জ্বল দীপ্তিতে প্রকাশ পাইতেছে। সহস্র মশালের আলোক, ভক্তবৃন্দের উন্মত্ত অঙ্গভঙ্গী সহকারে নিরন্তর জয়দেব ধ্বনি, ঘন ঘন ঢক্কা নিনাদ এবং বৃহৎ লোকারণ্যসমুত্থিত মহাকলরব একত্র মিশিয়া এই সন্ধ্যাছায়ালীন সমুদ্রোপকূলে গণপতির উৎসব নিবিড়তর করিয়া তুলিয়াছে। অজ্ঞান বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতেছে, উচ্চৈঃস্বরে বন্দনা-গান-গাহিয়া আবেগভরে করতালি দিতেছে, মশাল জ্বালিয়া, ঢক্কা-নিনাদ করিয়া, উৎসব ঘোষণা করিতেছে; জ্ঞান অটল গাম্ভীর্য্যে নিশ্চল স্তিমিত, —চক্ষে পলক পড়েনা, অঙ্গ উচ্ছ্বাসে আন্দোলিত হয়না, বেদনা ভাষাহীন হইয়া অন্তর্নিরুদ্ধ এবং মুখশ্রী ভাবে সর্ব্বদাই বিকসিত।

এই গণেশ উৎসব বোম্বাই নাট্যশালার একটি প্রধান দৃশ্য। অভিনয় অধিক নহে, কিন্তু এরূপ সুবৃহৎ জনতা কদাচ দেখা যায়। সে দিন

রাজপথে বিপুল জনতা—উৎসবের স্মৃতি

সমুদ্রোপকূলে রাজপথে সমস্ত বোম্বাই সহর ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং উন্মুক্ত প্রাসাদ-বাতায়ন সকল হইতে কুল-ললনাগণের কুবলয়-দৃষ্টি নিপতিত হইয়া এই উষ্ণীষখচিত বিবিধবেশ-বর্ণবৈচিত্র্যকে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলে। একে একে যখন আলোক নিবিয়া আসে, প্রতিমা সকল সমুদ্রগর্ভে বিসর্জ্জিত হয়, জনতা সহস্র পথ দিয়া গৃহাভিমুখী হইতে থাকে, বোম্বায়ের বর্ষব্যাপী এক অঙ্কের অভিনয় যেন সমাপ্ত হইয়া আসে, একবার যেন ক্ষণকালের জন্য পটক্ষেপ হয় এবং দর্শকের মনে কেবল এই বসন-ভূষণবর্ণধ্বনি, এই আকাশ-সমুদ্র এবং আকাশপটে মুদ্রিত শ্যাম শৈলশ্রেণী ও সমুদ্রগর্ভে প্রতিবিম্বিত চারু বোম্বাই সহর, এই কোলাহল, কলরব, উৎসব, মোহবৎ ঘনীভূত হইয়া আসে এবং সমস্ত শিরা ও স্নায়ুর মধ্যে একটি তড়িত্তরঙ্গের অনুকম্পন বহুক্ষণ ধরিয়া স্পন্দিত হইতে থাকে।

## রোশনীবাগ।

মুর্শিদাবাদের বর্ত্তমান নবাব-প্রাসাদের সম্মুখে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে একটি সুন্দর ছায়াময় ও শান্তিময় উদ্যান দৃষ্ট হইয়া থাকে; এই উদ্যানটির নাম রোশনীবাগ। রোশনীবাগ ডাহাপাড়া গ্রামে অবস্থিত। উদ্যানটি আকারে বৃহৎ না হইলেও ইহার রমণীয়তা সর্ব্বজনপ্রশংসনীয়। এই উদ্যানের সম্মুখে পূর্ব্বে নবাবদিগের আলোকোৎসব হইত বলিয়া সাধারণতঃ সেইস্থানকে রোশনীবাগ বলে। আম্র প্রভৃতি বৃক্ষরাজি আপনাদিগের শ্যামপত্রপূর্ণ শাখা বিস্তার করিয়া পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া থাকায়, রোশনীবাগের অভ্যন্তরে সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিতে পারেনা; এইজন্ত স্থানটিকে অত্যন্ত ছায়াময় করিয়া রাখিয়াছে। নিদাঘের মধ্যাহ্ন সময়ে এই রমণীয় উদ্যানের ছায়াতলে উপস্থিত হইলে, শরীর স্নিগ্ধ হইয়া যায়; এবং ধীরে ধীরে মলয়-সমীরণ প্রবাহিত হইয়া শরীরকে শীতল করিয়া তুলে। সেই সময়ে উদ্যানের চারিপাশ হইতে নানাবিধ সুন্দর বিহঙ্গের মধুরধ্বনি কর্ণকুহরে অমৃত ঢালিয়া দেয়, আবার উদ্যানের স্থানে স্থানে নানাবিধ প্রস্ফুটিত পুষ্প চারিদিকে সুগন্ধ বিস্তার করিয়া মনঃপ্রাণ প্রফুল্ল করিতে থাকে।

রোশনীবাগ

এই রমণীয় উদ্যানের ছায়াতলে মুর্শিদাবাদের দ্বিতীয় নবাব সুজাউদ্দীন চিরসমাহিত আছেন। সুজাউদ্দীন মুর্শিদকুলী জাফর খাঁর জামাতা; সুজা পূর্ব্বে উড়িষ্যার শাসনকর্তৃত্বপদে নিযুক্ত ছিলেন; তাঁহার উড়িষ্যায় অবস্থানকালে, আলিবর্দ্দী খাঁ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা হাজী আহাম্মদ সুজার অধীনতায় কার্য্যে নিযুক্ত হন; পরে তাঁহার নিজামতী সময়ে তাঁহাদিগের আরও

সুজাউদ্দীন

উন্নতি হয়। সুজাউদ্দীনের তুল্য ন্যায়পর নবাব অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহার ন্যায় পরোপকারিতা, অমায়িক ব্যবহার ও ন্যায়ানুমোদিত শাসন মুর্শিদাবাদের কোন নবাবে দেখিতে পাওয়া যায়না। মুর্শিদাবাদের নবাবদিগের মধ্যে তিনিই প্রথমে হিন্দু, মুসলমান উভয় জাতিকে সমভাবে প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করেন। মুতাক্ষরীণকার নওশেরোয়াঁর রাজত্বের সহিত তাঁহার রাজত্বের তুলনা করিয়াছেন। মুর্শিদকুলী খাঁ যে সমস্ত জমীদারদিগকে বন্দী অবস্থায় রাখিয়া অশেষ কষ্ট প্রদান করিয়াছিলেন, সুজাউদ্দীন তাঁহাদিগকে মুক্ত করিয়া এবং মুর্শিদকুলীর হিন্দুদিগের প্রতি অত্যাচারী কর্ম্মচারীদিগের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়া সর্ব্বাপেক্ষা ন্যায়পরতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার শাসনে হিন্দু, মুসলমান উভয়বিধ প্রজাই প্রীতছিল।

ফর্‌হাবাগ বা সুখকানন

সুজাউদ্দীন নানাবিধ সদ্‌গুণে সমলঙ্কৃত থাকিলেও তাঁহার কিঞ্চিৎ দোষ ছিল। সুজা মুর্শিদাবাদের মসনদে উপবেশন করিয়া অত্যন্ত বিলাসী হইয়া উঠেন। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর নির্ম্মিত অট্টালিকাদি সুজার বিবেচনায় তাদৃশ মনোরঞ্জক না হওয়ায়, তিনি তৎপরিবর্ত্তে অনেক সুন্দর সুন্দর অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করেন। সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার শ্রেষ্ঠকীর্ত্তি একটি উদ্যান; এই উদ্যানটির নাম ফর্‌হাবাগ বা সুখকানন। ফর্‌হাবাগ ডাহাপাড়াতেই অবস্থিত, এবং রোশনীবাগ হইতে কিছু উত্তরে। মুর্শিদকুলীর জনৈক অত্যাচারী কর্ম্মচারী নাজীর আহম্মদ এই উদ্যানের নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়া তথায় মস্‌জেদাদির গঠন করিতেছিল। নবাব সুজাউদ্দীন তাহার অত্যাচারের প্রতিফলস্বরূপ প্রাণদণ্ডের বিধান করিয়া পরে নিজে সেই উদ্যানটিকে সুশোভিত করিয়াছিলেন। মস্‌জেদটি সুন্দররূপে নির্ম্মাণ করিয়া তিনি উদ্যানের রমণীয়তা চতুর্গুণ বর্দ্ধিত করেন। ঐ উদ্যানের

মধ্যে সুন্দর সুন্দর প্রমোদ-অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়। উহাতে নানা জাতীয় বৃক্ষ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শোভা পাইত। স্থানে স্থানে ফোয়ারা, চৌবাচ্চা ও নহর জলভরে টল টল করিয়া উদ্যানটীকে একখানি ছবির ন্যায় প্রতিপন্ন করিত। ঐ উদ্যানে পুষ্করিণী খনন করিয়া চারিদিক সোপান দ্বারা সুশোভিত করা হইয়াছিল। নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া লোকের মনঃপ্রাণ কাড়িয়া লইত। মুসলমান লেখকগণ বলেন যে, ইহার রমণীয়তার নিকট কাশ্মীরের উদ্যানসকল লজ্জা পাইত, এমন কি, স্বর্গের উদ্যানও ইহার নিকট হইতে সৌন্দর্য্য ঋণ করিয়া লইত। উদ্যানের রমণীয় শোভায় মুগ্ধ হইয়া স্বর্গের পরীগণ ইহাতে ভ্রমণ করিতে আসিত, এবং ইহার চারুসোপানাবলীসমন্বিত পুষ্করিণীর স্ফটিকশুভ্র স্বচ্ছজলে অবগাহন করিয়া, কুসুমগন্ধাপহারী মলয়সমীরে শরীর সুস্নিগ্ধ করিত। নবাব, প্রহরীদের নিকট পরীদিগের আগমনের কথা অবগত হইয়া, বিপদাশঙ্কায়, ধূলিবৃষ্টি দ্বারা উদ্যানের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়াছিলেন।

ফর্হাবাগের দৃশ্য—গুণী ও বিদ্বজ্জন-সম্মিলন

মুসলমান লেখকগণ এইরূপে ফর্হাবাগের অশেষ বর্ণনা করিয়া থাকেন। যখন বসন্তকালে বসন্তের মধুরস্পর্শে উদ্যানস্থ বৃক্ষরাজি নব পল্লবে পরিশোভিত হইয়া শ্যামলতার ঢেউ খেলাইতে খেলাইতে আকাশের নীলিমার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইত, নানাবিধ প্রফুল্ল কুসুম আপনাদিগের সুগন্ধ বিতরণে মলয়-সমীরণের প্রত্যেক অণুকে অধিবাসিত করিয়া তুলিত, চূতমঞ্জরীর গন্ধে মাতোয়ারা হইয়া পিককুল অবিরত পঞ্চমে তান ছড়াইত এবং অন্যান্য সুকণ্ঠ বিহঙ্গগণের মধুর কাকলীতে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিত, সেই সময় নবাব সুজাউদ্দীন ফর্হাবাগে সমাগত হইয়া আমোদপ্রমোদে সময় অতিবাহিত করিতেন। ঝর ঝর শব্দে অবিরত ফোয়ারাগুলি সলিলবৃষ্টি করিতে থাকিত, সলিলভরে পরিপূর্ণ

পুষ্করিণী, চৌবাচ্চা, নহরগুলি ঈষৎ সমীরস্পর্শে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ তুলিয়া নৃত্য করিয়া উঠিত, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে বিহঙ্গমগণের কণ্ঠধ্বনির সহিত মধুর মানবকণ্ঠ মিশ্রিত হইয়া দিগন্তহৃদয়ে মধুরধারা ঢালিয়া দিত। যদি স্বর্গের পরীগণ বাস্তবিকই পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে আসে, তাহা হইলে ফর্হাবাগের ন্যায় উদ্যানে তাহাদের আগমন বড় বিচিত্র নহে। মধ্যে মধ্যে নবাব স্বীয় অন্তঃপুরবাসিনীগণের মনোরঞ্জনের জন্য এই সুখকাননে সমবেত হইয়া নানাবিধ পবিত্র আমোদপ্রমোদ উপভোগ করিতেন। বাস্তবিকই ফর্হাবাগে তিনি প্রকৃত সুখের আস্বাদ পাইতেন। এই সমস্ত আমোদপ্রমোদ ব্যতীত তিনি আর একটি প্রশংসনীয় আমোদ উপভোগ করিতেন। সুজা প্রতিবৎসর যাবতীয় বিদ্বান ও গুণীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া সকলকে সমাদরের সহিত ফর্হাবাগে লইয়া যাইতেন, এবং তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করাইতেন। নবাব সুজাউদ্দীন বিলাসী হইয়াও যে গুণের মর্য্যাদা করিতেন, ইহা হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

ফর্হাবাগের বর্ত্তমান অবস্থা

সুজাউদ্দীনের সাধের ফর্হাবাগ এক্ষণে হতশ্রী হইয়া ধূ ধূ করিতেছে। সে সমস্ত শ্রেণীবদ্ধ সুন্দর বৃক্ষরাজির চিহ্নমাত্রও নাই। মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী শুষ্ক অবস্থায় রহিয়াছে। অল্পদিন হইল, ভাগীরথী মস্‌জেদটিকে নিজ গর্ভে আশ্রয়দান করিয়াছেন। নহর, চৌবাচ্চা, এ সকলের কোন নিদর্শন দেখা যায়না, মধ্যে মধ্যে অট্টালিকার ভিত্তির ভগ্নাবশেষ মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণদিকের একটি তোরণদ্বারের এবং উত্তর দিকের প্রাচীরের কতকটা ভগ্নাবশেষ আজিও বর্ত্তমান আছে। ফর্হাবাগের মধ্যে দুই এক ঘর কৃষক বাস করিতেছে; তাহারা উদ্যানের ভূমি কর্ষণ করিয়া, তাহাতে সর্ষপাদি শস্য বপন করিয়া থাকে। স্থানটিকে আজিও

ফর্হাবাগ বলে; নতুবা লোকে অনুসন্ধান করিয়াও সুজাউদ্দীনের প্রমোদ-কাননের স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারিতনা।

সুজাউদ্দীন হিজরী ১১৩৯ অব্দে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ১১৫১ অব্দে পরলোকগমন করেন। রোশনীবাগের ছায়াতলে তিনি বিশ্রাম লাভ করিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহার সমাধিভবনটির সংস্কার হওয়ায় ইহাকে অত্যন্ত সুন্দর বোধ হইতেছে। আম্র প্রভৃতি বৃক্ষ সকল এই সমাধিভবন ও মসজেদকে ছায়া দ্বারা আবৃত করিয়া অতীব মনোরম করিয়া রাখিয়াছে। মুর্শিদাবাদের মধ্যে এরূপ ছায়াময় ও শান্তিময় স্থান অতি বিরল। উদ্যানের স্থানে স্থানে পুষ্পসকল প্রস্ফুটিত হইয়া আছে। রোশনীবাগের সমাধি-মন্দিরের নিম্ন দিয়া ভাগীরথী প্রবাহিতা হইতেছেন। বর্ষাকালে তাঁহার সলিলরাশি উদ্যান-প্রাচীরের অতি নিকটে উপস্থিত হয়। বৈদেশিক ভ্রমণকারিগণ ছায়াময় রোশনীবাগের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

সুজাউদ্দীনের সমাধিভবন



# অশোকের কলিঙ্গবিজয়।

কলিঙ্গ-বিজয় সম্রাট্ অশোকের পূর্ব্বাপর জীবনের একটি অপূর্ব্ব সন্ধিক্ষণ। মানবজীবনে এমন মুহূর্ত্ত আসে, যখন কোন একটি সামান্য ঘটনায় চিরসঞ্চিত সংস্কাররাশি স্বপ্নবৎ কোথায় বিলীন হইয়া যায় এবং অচিরে হৃদয়মধ্যে ঘোরতর বিপ্লব সঞ্চার করিয়া এক নূতন পথে মানবের জীবনগতি পরিবর্ত্তিত করে। যে জরাগ্রস্ত, বৃদ্ধ বা প্রাণহীন শব আমরা নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি ও ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির আর্ত্তনাদে ক্ষণিকমাত্র ব্যথিত হইতেছি, সেই জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ, শবদেহ ও রোগকাতর আতুরকে দেখিয়া রাজপুত্র শাক্যসিংহ রাজৈশ্বর্য্য ও স্ত্রীপুত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক দীনহীন ভিক্ষুকবেশে জগতের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং ত্রিতাপক্লিষ্ট নরনারীকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই সাধনার ফল স্বরূপ এক নূতন মহাসত্য জীবনে উপলব্ধি করিয়া, লোকের কল্যাণার্থ তাহা বিতরণ করিবার জন্য, তিনি দ্বারে দ্বারে আকুল হইয়া ফিরিয়াছেন। সেই নিমিত্তই শাক্যসিংহ লক্ষ লক্ষ নরনারীর হৃদয়ে নিত্য সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মহাপুরুষদিগের জীবনে প্রায়ই এইরূপ ঘটনা সংঘটিত হয়। অশোকের জীবনে কলিঙ্গ-বিজয় এইরূপ একটী শুভ পরিবর্ত্তনের মুহূর্ত্ত।

সামান্য ঘটনায় জীবন-গতির পরিবর্ত্তন—শাক্য-সিংহের গৃহত্যাগ—সাধনা ও মহাসত্য প্রচার

অশোকের সিংহাসনাধিরোহণের ত্রয়োদশবর্ষ অথবা তাঁহার রাজ্যাভিষেকের অষ্টমবর্ষ পরে খ্রীঃ পূঃ ২৬১ অব্দে তাঁহার সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম লিপিবদ্ধ ঘটনাবলী দৃষ্টিগোচর হয়। বঙ্গোপসাগরের উপকূলে মহানদী ও

গোদাবরী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী কলিঙ্গ বা কলিঙ্গত্রয় নামে আখ্যাত বিশালরাজ্য জয় করিয়া তাঁহার বিপুল সাম্রাজ্য মণ্ডলাকারে পরিবর্দ্ধিত করিতে তিনি সেই বৎসর উদ্যম করেন। বিজয়লক্ষ্মী তাঁহার প্রতি প্রসন্না হইলেন। কলিঙ্গরাজ্য তাঁহার বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। কিন্তু

অশোকের কলিঙ্গ-বিজয়

রণক্ষেত্রের হৃদয়ভেদী ভীষণ দৃশ্যাবলী বিজয়ী সম্রাটের অন্তরের গভীরতম প্রদেশে চির-দিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া রহিল। বিপদের ঘন তিমিরে তাঁহার চিত্ত আবরিত হইল, বিজয়ের ভাস্কর-ছটা সে গভীর আবরণ ভেদ করিয়া তাঁহার মানস-ক্ষেত্র আলোকিত করিতে পারিলনা। পর্ব্বতগাত্রে, প্রস্তরফলকে, অমর-বাণীতে বিজিতের মর্ম্মন্তুদ যাতনা, জেতার গভীর অনুতাপ হৃদয়ের আবেগে সম্রাট্ ক্ষোদিত করাইলেন। তাহার প্রতি অক্ষর তাঁহার অন্তরের গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত। যুগ যুগান্তর অতীত হইয়াছে, আজিও সে লিপি পাঠ করিলে একটি ব্যথিত মানবাত্মার করুণ মর্ম্মোচ্ছ্বাস যেন কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। সে ভাষা সম্রাটের নিজের প্রাণের ভাষা, কোন অমাত্য বা রাজসচিবের সাধ্য নাই, যে সেরূপ ভাষায় মহারাজ অশোকের গভীর দুঃখ ও অনুতাপ বর্ণনা করিতে পারে। প্রস্তররাজি সজীবের ন্যায় নিম্নলিখিত অপূর্ব্ব ইতিহাস ঘোষণা করিতেছে—

রণক্ষেত্রের স্মৃতি—গভীর বিষাদ—ক্ষোদিত লিপিতে করুণ মর্ম্মোচ্ছ্বাস

পবিত্রচরিত উদারচেতা সম্রাট্ তাঁহার অভিষেকের ৮ কিম্বা ৯ বৎসর পরে কলিঙ্গরাজ্য জয় করেন। সেই মহাহবে সার্দ্ধলক্ষ লোক বন্দী হইয়া আনীত হয়, তিন লক্ষ লোক হত এবং কত লক্ষ লোক যে বিনষ্ট হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই।

কলিঙ্গ-সমরে বন্দীকৃত ও হতাহত লোকের সংখ্যা

"কলিঙ্গ-বিজয়ের অব্যবহিত পরেই, পূতচরিত সম্রাটের মৈত্রিধর্ম্ম-রক্ষা, সেই ধর্ম্মে প্রীতি এবং সেই ধর্ম্মের শিক্ষাপ্রদান আরব্ধ হয়। এইরূপে সম্রাটের কলিঙ্গ-বিজয়জনিত গভীর অনুতাপের সূচনা হয়, যেহেতু কোন স্বাধীন রাজ্য জয় করিতে হইলে অসংখ্য প্রাণীর হত্যা, জীবননাশ এবং বন্দীকরণ অবশ্যম্ভাবী। তাহা পবিত্রচেতা সম্রাটের গভীর দুঃখ ও অনুশোচনার বিষয় হইয়াছে। কলিঙ্গ-যুদ্ধে যে সমস্ত লোক হত, বন্দী ও তৎপরে বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার শতাংশ বা সহস্রাংশের একাংশ লোক বিনষ্ট হইলে ও এক্ষণে করুণাপূর্ণ সম্রাটের গভীর মর্ম্মবেদনায় কারণ হইবে।" উপদেষ্টা সম্রাট তৎপরে বিশদভাবে যুদ্ধের নৃশংস ব্যাপার সমূহ বর্ণনা করিয়া এই মহাসত্য শিক্ষা দিয়াছেন যে, প্রেমের জয়ই প্রকৃত জয়।

অশোকের মৈত্রিধর্ম্ম—যুদ্ধক্ষেত্রে নৃশংসাচরণ জনিত অনুশোচনা—প্রেমের জয়



# জাহাঙ্গীরের প্রতিশ্রুতিপালন ও ধর্ম্মোপদেশ।

[ মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁহার আত্মজীবনীতে নিম্নোক্ত প্রতিশ্রুতিপালনকাহিনী ও ধর্ম্মোপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ]

পিতা মিরাণ সদর জাহানকে সমরবিভাগের কোনো উচ্চকর্ম্মে নিয়োগ করেন এবং ক্রমশঃ তাঁহার পদোন্নতি হয়। পরিশেষে তিনি সাম্রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান ভিক্ষাদাতার পদ লাভ করেন। সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে, মিরাণ সদর জাহান সর্ব্বদাই আমাদের একান্ত অনুগত। ধর্ম্ম এবং বীর্য্যেও তিনি অতিশয় উচ্চ। তিনি এরূপ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ও বিশ্বস্ততার সহিত সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন যে, তাহাতে আমার প্রতি তাঁহার আশৈশব একান্ত অনুরাগই প্রকাশ পাইতেছে। আমি যখন যুবরাজ ছিলাম, তখনই তাঁহাকে কোনো উচ্চপদে নিয়োগ এবং তাঁহার সর্ব্বপ্রকার ঋণ পরিশোধ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম। হিন্দুস্থানের সিংহাসনারোহণ করিয়াই আমি তাঁহাকে আমার প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া তাহা পালন করিব বলিয়া জানাইলাম। তিনি সংবাদ পাঠাইলেন যে, তাঁহাকে যদি চারি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক-পদ প্রদান করা হয়, তবে তিনি তদ্দ্বারাই তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিতে সমর্থ হইবেন, তিনি অন্য কিছু আকাঙ্ক্ষা করেননা। আমার নিয়ম ছিল যে, সর্ব্বাগ্রেই কাহাকেও একশতের অধিনায়ক অপেক্ষা উচ্চপদ প্রদান করা হইবেনা। তথাপি তাঁহার প্রার্থনানুসারে আমি তাঁহাকে চারি সহস্রের পদে অভিষিক্ত করিলাম।

মিরাণ সদর জাহান—জাহাঙ্গীরের প্রতিশ্রুতি-পালন



জাহাঙ্গীর।

বাস্তবিক সহস্র তীর্থে গমন করা অপেক্ষা একটি বিশ্বস্ত হৃদয়ের প্রগাঢ় প্রেম লাভ করাই আমি অধিকতর মূল্যবান মনে করি।

জাহাঙ্গীরের ধর্ম্মোপদেশ

সাধ্যাতীত না হইলে, স্বধর্ম্মী কিংবা বিধর্ম্মী গণনা না করিয়াই আমি সকল লোকের আশা পূর্ণ করিতে নিতান্ত ইচ্ছুক। আমার ন্যায় কত সহস্র লোক কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু এই সৌর জগৎ স্থির রহিয়াছে। যে ক্ষণস্থায়ী সময়ের জন্য আমরা এই পৃথিবীতে আছি, তন্মধ্যেই এমন কিছু করিয়া যাইতে হইবে, যাহার ফল অনন্তকাল স্থায়ী এবং যাহাতে আমাদের পরকাল সুখপূর্ণ হইতে পারে। এই পৃথিবীতে সহৃদয়তা, সপ্রেম ব্যবহার, মনুষ্যের প্রেম ও প্রীতির মূল্য নাই। দুষ্ট সন্তানগণের অপব্যয় করিয়া উড়াইয়া দিবার জন্য অগণিত ধনরাশি এবং রত্নালঙ্কার রাখিয়া যাওয়া অপেক্ষা একটিমাত্র হৃদয়ের প্রেম লাভ করা, একটিমাত্র মনুষ্যকে সুখী করা, আমি অধিকতর মূল্যবান জ্ঞান করি, ইহাই আমার পক্ষে অধিকতর আদরণীয়। স্মরণ রাখিয়ো যে, এই পৃথিবীই আমাদের চিরবাসস্থান নহে। এ স্থানের কোনো দ্রব্যের উপরই অনন্ত আশা এবং চির বিশ্বাস স্থাপন করিও না। তুমি কি শ্রবণ কর নাই, কিরূপে ঐ পাশ্চাত্য দেশে মহান্ সলোমনের সিংহাসনও চূর্ণ হইয়াছিল? যিনি জ্ঞান, ধর্ম্মালোচনা এবং মানবের সুখ-শান্তি বিধানার্থ হিতকর কার্য্যে জীবনক্ষেপণ করেন, তিনিই সর্ব্বতোভাবে সুখী। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ধর্ম্মালোচনায় জীবনক্ষেপণ করেন, কিন্তু তুমি যে প্রকার কার্য্যেই লিপ্ত থাক না কেন, এই জীবন দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতেছে। যে সম্পত্তি যক্ষের ধনের ন্যায় সঞ্চয় করিয়াছ এবং যাহা তোমার পশ্চাতে রাখিয়া যাইতে বাধ্য হইবে, তাহার অন্বেষণে দৌড়ান মরীচিকার অনুসরণ মাত্র। যদ্দ্বারা তুমি অমরজীবন লাভ করিবে এবং তোমার কীর্ত্তি চিরস্থায়ী হইবে, তাহাই সঞ্চয় করিবার জন্য মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিতে হইবে।

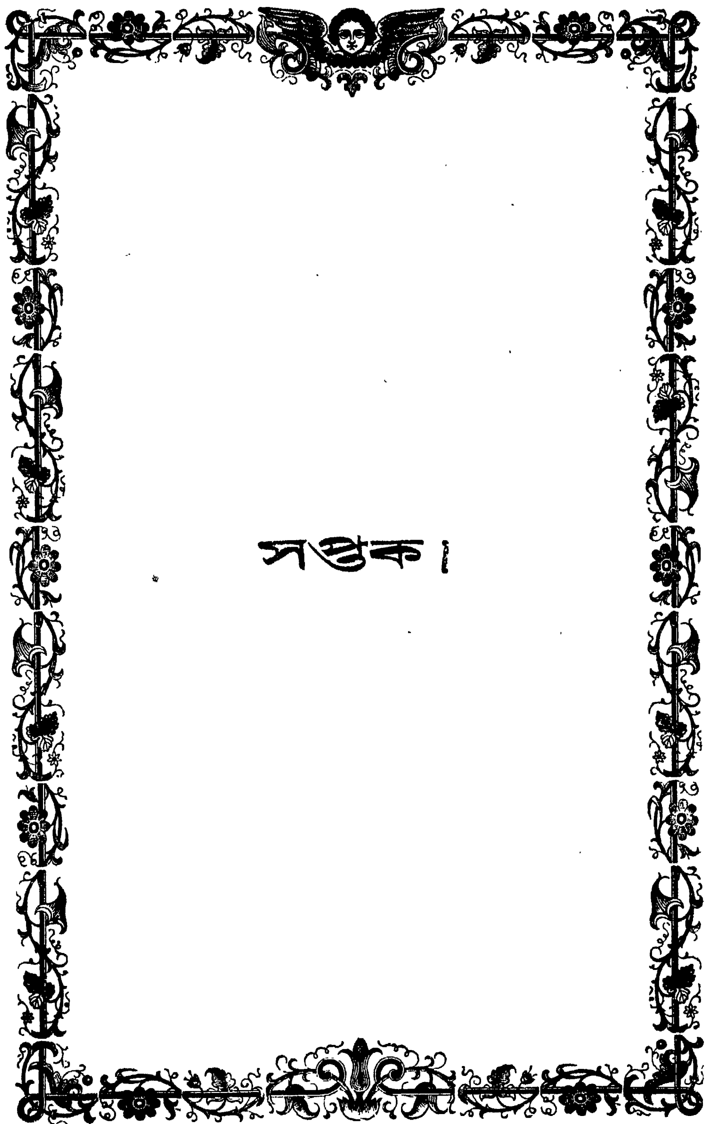
# প্রার্থনা।

হে বিভো! আশীর্ব্বাদ কর,—আমরা তোমার মঙ্গলচ্ছায়া যেন গৃহের মধ্যেই দেখিতে পাই; তোমার প্রসাদ যেন এই জীবনেই অনুভব করি; তোমার প্রতি যেন আমাদের প্রীতি অর্পিত থাকে এবং সেই প্রীতি যেন আমাদের প্রেম, স্নেহ, বাৎসল্য, বন্ধুতা,—সকলকে পবিত্র ও মধুময় করে। আমরা যেন বিমল হৃদয়ে তোমার প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারি এবং পরস্পরের সাহায্যে তোমাকে আর ও উজ্জ্বলরূপে জানিতে ও প্রীতি করিতে পারি। হে বিভো! আমাদের মৌখিক পূজা কিছুই নয়; আমরা যেন আমাদের সমগ্র জীবন ও চরিত্রের দ্বারা তোমার পূজার উপযুক্ত হইতে পারি; যেন হৃদয়মনকে নির্ম্মল রাখিয়া এবং জীবনের কর্ত্তব্য সকল সুচারু রূপে সম্পন্ন করিয়া, তোমার চরণে বসিবার উপযুক্ত হই। জ্ঞানে গভীরতা, প্রেমে বিশালতা, চরিত্রে সংযম, কর্ত্তব্য জ্ঞানে দৃঢ়তা ও নরসেবা,—এই যে পূর্ণাঙ্গ সাধু-চরিত্রের আদর্শ, ইহা যেন আমরা সাধন করিতে পারি। তুমি আমাদিগকে যে সুখ-সম্পদ দিয়াছ, তাহা কেবল মাত্র আমাদের নিজের জন্য নহে, তাহা অপরের ও জন্য, ইহা যেন সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে পারি। আমাদিগকে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে রক্ষা কর, এবং দিন দিন তোমার পথে অগ্রসর কর।

---



# পঞ্চম স্তবক।



# সপ্তক।






আনন্দময়ীর আগমনে
আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে।
হের ওই ধনীর দুয়ারে
    দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে।
বাজিতেছে উৎসবের বাঁশী,
    কাণে তাই পশিতেছে আসি,
ম্লান চোখে তাই ভাসিতেছে
    দুরাশার সুখের স্বপন।
চারিদিকে প্রভাতের আলো
    নয়নে লেগেছে বড় ভালো,
আকাশেতে মেঘের মাঝারে
    শরতের কনক তপন।
কত কে যে আসে, কত যায়,
    কেহ হাসে, কেহ গান গায়,
কত বরণের বেশ-ভূষা,
    ঝলসিছে কাঞ্চন-রতন।

কত পরিজন দাসদাসী,
পুষ্প-পাতা কত রাশি রাশি,
চোখের উপরে পড়িতেছে
মরীচিকা-ছবির মতন।
হেরি তাই রহিয়াছে চেয়ে,
শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে।

শুনেছে সে, মা এসেছে ঘরে,
তাই বিশ্ব আনন্দে ভেসেছে,
মার মায়া পায়নি কখনো,
মা কেমন দেখিতে এসেছে।
তাই বুঝি আঁখি ছল ছল,
বাষ্পে ঢাকা নয়নের তারা,
চেয়ে যেন মার মুখ পানে
বালিকা কাতর অভিমানে
বলে মাগো, এ কেমন ধারা!
এত বাঁশী, এত হাসিরাশি,
এত তোর রতন-ভূষণ,
তুই যদি আমার জননী,
মোর কেন মলিন বসন!"

ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলি
ভাই বোন্ করি গলাগলি,
অঙ্গনেতে নাচিতেছে ওই,
বালিকা দুয়ারে হাত দিয়ে,
তাদের হেরিছে দাঁড়াইয়ে,

ভাবিতেছে নিশ্বাস ফেলিয়ে
"আমিত ওদের কেহ নই!
স্নেহ ক'রে আমার জননী
পরায়েত দেয়নি বসন,
প্রভাতে কোলেতে ক'রে নিয়ে
মুছায়েত দেয়নি নয়ন।"

আপনার ভাই নাই ব'লে
ওরে কিরে ডাকিবেনা কেহ!
আর কারো জননী আসিয়া
ওরে কিরে করিবেনা স্নেহ!
ও কি শুধু দুয়ার ধরিয়া
উৎসবের পানে রবে চেয়ে,
শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে!

ওর প্রাণ আঁধার যখন
করুণ শুনায় বড় বাঁশী,
দুয়ারেতে সজল নয়ন,
এ বড় নিষ্ঠুর হাসিরাশি!
আজি এই উৎসবের দিনে
কত লোক ফেলে অশ্রুধার,
গেহ নাই, স্নেহ নাই, আহা!
সংসারেতে কেহ নাই তার!
শূন্য হাতে গৃহে যায় কেহ,
ছেলেরা ছুটিয়া আসে কাছে,

কি দিবে কিছুই নাই তার,
চোখে শুধু অশ্রুজল আছে ।

অনাথ ছেলেরে কোলে নিবি
জননীরা আয় তোরা সব,
মাতৃহারা মা যদি না পায়,
তবে আজ কিসের উৎসব !
দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া
ম্লানমুখ বিষাদে বিরস,
তবে মিছে সহকার-শাখা,
তবে মিছে মঙ্গল-কলস ।

---

# কীর্ত্তি

কীর্ত্তির প্রসাদে নর অমর ধরায়,
পার্থিব বৈভব যত সকলি নশ্বর।
রূপ যায়, বিত্ত যায়, যৌবন লুকায়,
বার্দ্ধক্যে বিকৃত হয় শরীর সুন্দর।

২

ভোগ-সুখে জীবনের কাল দীর্ঘ নয়,
মার্জ্জিত করিলে তনু, তবু জরা আসে।
সম্পদ-ঐশ্বর্য্য কোথা চিরদিন রয়?
দিনে দিনে,—দণ্ডে দণ্ডে, কাল আয়ুঃ নাশে

৩

এই যে ধনীর এত বিভব অতুল,
ফুরাইলে সেই ধন, ধনীর তখন
রহেনা পূর্ব্বের মত সম্মান বিপুল,
ধনাঢ্য বলিয়া লোকে না করে গণন।

৪

সর্ব্বগ্রাসী কাল তারে গ্রাসিবে যখন,
নাহি রবে কোন চিহ্ন মরণের পরে,
অনিত্য সম্পদ্ আর নশ্বর জীবন
চিরতরে লয় হবে সময়-সাগরে।

অতঃপর নাম-গন্ধ রহিবেনা আর,
কাল-সাগরেতে যবে মিশিবে জীবন ;
জল-বুদ্বুদের মত অস্তিত্ব তাহার,
বিস্মৃতি-সলিলে হবে অচিরে মগন।

৬

কিন্তু যাঁর কীর্ত্তিরশ্মি দিক্ দিগন্তরে
রবির কিরণ সম আছে বিরাজিত,
মরণান্তে কিংবা যুগ-যুগান্তর পরে,
হয় কি তাঁহার নাম কভু অন্তর্হিত ?

৭

অমরতা লভিবারে পারে সেইজন,
নাহি ডুবে যেইজন বিস্মৃতি-সাগরে ;
পড়িয়া কালের গ্রাসে হারালে জীবন,
রহে তাঁর চিরস্থির কীর্ত্তি এ সংসারে।

৮

চৈতন্য, গৌতম, খৃষ্ট, মানবের মনে
আরাধ্য দেবতা সম তাই সম্পূজিত,
যতকাল চন্দ্র, সূর্য্য, রহিবে গগনে,
তাঁহাদের যশোরাশি হবে বিঘোষিত।

৯

কবিকুল-শিরোমণি কবি কালিদাস
কীর্ত্তির কিরীট পরি, হয়েছে অমর ;

বিস্মৃতির অন্ধকার করিয়া বিনাশ
উজলিছে কীৰ্ত্তি তাঁর যথা দিবাকর।

১০

মানব-মণ্ডলী মাঝে ধন্য সেই জন,
কীৰ্ত্তির প্রসাদে যেই হ'য়েছে অমর;
চিরকাল নর যাঁরে করিছে স্মরণ,
সেইজন বরণীয় অবনী-ভিতর।

---

# বুদ্ধের প্রতি সুজাতা।

[ বুদ্ধদেবের নৈরঞ্জনানদীতীরে অবস্থানকালে উরুবিল্বের অদূরস্থিত নন্দিক গ্রামের অধিপতি সেনানীর কন্যা পুণ্যশীলা সুজাতা তাঁহার সেবার জন্য পায়স প্রস্তুত করিয়া আনয়ন করেন। এই সময়ে অলৌকিকদীপ্তিসম্পন্ন, দেবকান্তি শুদ্ধ বুদ্ধ মূর্ত্তি দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে যে ভাবোদ্রেক হয়, এই কবিতায় তাহাই অভিব্যক্ত হইয়াছে। ]

১

কে তুমি হেথা বিজনে বসি !
নর, কি ঋষি, দেবতা !
অঙ্গ ছাপি পুণ্য-প্রভা চমকে !
দীপ্ত তব বদন নব,
তপ্ত যেন সবিতা,
নিরখি নর-নয়ন সদা ঝলকে।

২

ক্লান্ত নহে কান্ত তনু
করি কঠোর সাধনা ;
নহ ত প্রভো ! তাপস তবে নহ গো !
সুপ্তিহারা নয়নে ধারা,
উছলে সে যে করুণা !
ধেয়ান রত ঋষিত তুমি নহ গো !

৩

দেবতা তুমি, জগত-ভূমে
এসেছ, প্রভো ! এসেছ,
ফুটাতে প্রীতি কঠোর হৃদি-শিলাতে।

হরিতে পাপ, বাসনা-তাপ,
এসেছ, প্রভো ! এসেছ,
মরণ নাশি অমৃত-রাশি বিলা'তে।

৪

জগৎ যবে শরণ লবে
চরণতলে কাঁদিয়া,
পিপাসা-ক্ষুধা মিটাবে সুধা ঢালিয়া।
বিশ্বপাতা, অন্নদাতা !
পূজিব তবে কি দিয়া ?
ল'বে কি এই অন্ন কৃপা করিয়া!

# রাতকোট।

[ সূত্রধরবংশীয়া একটি পরিচারিকার গর্ভে মেবারের রাণা মকুলজীর পিতামহ রাণা ক্ষেত্র সিংহের চাচা ও মৈর নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়। ইহারা নিদারুণ প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য ইষ্টমন্ত্রজপনিরত মকুলজীকে অসির আঘাতে বধ করে এবং অবশেষে প্রাণভয়ে পায়ী নামক স্থানে গমন পূর্ব্বক তত্রত্য রাতকোট শৈলের সানুদেশে এক দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকে। মকুলের পুত্র কুম্ভ ও রাঠোর রাজ, চোহান বংশীয় সুজা নামক এক ব্যক্তির সহিত সম্মিলিত হইয়া গভীর নিশীথে রাতকোট দুর্গ আক্রমণ করেন। সুপ্তোত্থিত চাচা ও মৈর যথাক্রমে সুজা ও রাঠোর-রাজকুমারের তরবারির আঘাতে নিহত হয়। এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া পদ্যটি লিখিত হইয়াছে। ]

১

তামসী শর্ব্বরী, গত সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর,
সূচিভেদ্য অন্ধকার আবরি ধরায় ;
দেবতার কোটি চক্ষু নিশ্চল, ভাস্বর,
জ্বলিতেছে অতি উর্দ্ধে ভেদি তমিস্রায়।

২

হিল্লোলিত তরু-শীর্ষ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরি-
মধ্যে রাতকোট অদ্রি, উচ্চ সানুদেশে
দুর্ভেদ্য বিরাট দুর্গ,—অন্ধকার চিরি'
দাঁড়াইয়া ব্যোমপথে দৃপ্ত দৈত্য-বেশে।

৩

বহেনা সমীর ; শুধু সুদূর প্রপাতে
ঝর্ঝরিছে ক্ষীণকণ্ঠে করুণ কাহিনী ;

পার্ব্বতীয় প্রতিধ্বনি-ঘাতপ্রতিঘাতে
ধ্বনিছে বিচিত্র সুর ; সুষুপ্ত মেদিনী।

৪

এই রাতকোট দুর্গে নিমগ্ন নিদ্রায়
রাজদ্রোহী ভ্রাতৃদ্বয়,—নির্ম্মম পাষাণ ;
ইষ্টমন্ত্র জপে রত মুকুল রাণায়
অলক্ষ্যে হানিয়াছিল শাণিত কৃপাণ।

৫

উঠিতেছে গিরি-গাত্রে লতা-গুল্ম ধরি,
ক্রোধান্ধ চোহান্ সুজা দন্তে তরবার ;
পিছে কুম্ভ রাণা সহ এক এক করি'
উঠিছে মিবার-সৈন্য,—শৌর্য্যে দুর্ণিবার।

৬

দাঁড়ায়ে প্রাকার-শীর্ষে হেরে চারিধার,
দীপ্ত প্রতিহিংসা-জ্বালা জ্বলিছে নয়নে ;
একে একে, ধীরে ধীরে, নিঃশব্দে আবার
নামিতেছে জনহীন দুর্গের প্রাঙ্গণে।

৭

সহসা সঙ্কেত-ধ্বনি,—গভীর গর্জ্জন,
বাজিল পটহ-ভেরী,—সমর-ঘোষণা।
দেবতার রোষ-রুদ্ধ ভৈরব নিঃস্বন
বলিল, "পাপীর কভু নাহিক মার্জ্জনা।"

৮

আঘাতে আঘাতে চূর্ণ রুদ্ধ কক্ষদ্বার,
চকিতে পশিল কক্ষে উন্মত্ত চোহান্,
সভয়ে চাহিল দোঁহে, চক্ষু মুছিবার
পে'ল না সময়,—স্কন্ধে পড়িল কৃপাণ।

৯

ভূতলে লুটায় দোঁহে ; প্রস্তরে প্রস্তরে
অঙ্কিত কলঙ্ক-রেখা-রক্ত-প্রস্রবণ ;
গাহিলেন ভট্ট কবি প্রফুল্ল অন্তরে,
"ধর্ম্মের বিজয় চির, পাপীর পতন।"

# উপেক্ষা।

পথে দে'খে ঘৃণাভরে কত কেহ গেল স'রে,
উপহাস করি' কেহ যায় পায় ঠেলে ;
কেহ বা নিকটে আসি বরষি গঞ্জনারাশি,
ব্যথিতেরে ব্যথা দিয়া যায় শেষে ফেলে।
পতিত মানব তরে নাহি কি গো এ সংসারে
একটি ব্যথিত প্রাণ, দুটি অশ্রুধার ?
পথে প'ড়ে অসহায়, পদে তারে দ'লে যায়,
দু'খানি স্নেহের কর নাহি বাড়াবার ?
সত্য, দোষে আপনার চরণ স্খলিত তার,
তাই তোমাদের পদ উঠিবে ও শিরে ?
তাই তার আর্ত্তরবে সকলে বধির হ'বে,
যে যাহার চ'লে যাবে, চাহিবেনা ফিরে ?
বর্ত্তিকা লইয়া হাতে চলেছিল এক সাথে,
পথে নিবে গেছে আলো, পড়িয়াছে তাই,
তোমরা কি দয়া ক'রে তুলিবেনা হাত ধ'রে,
অর্দ্ধ দণ্ড তার লাগি থামিবেনা ভাই ?
তোমাদের বাতি দিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া নিয়া
তোমাদেরি হাত ধরি হোক্ অগ্রসর ;
পঙ্কমাঝে অন্ধকারে ফেলে যদি যাও তারে,
আঁধার রজনী তার রবে নিরন্তর।

---

## সেকেন্দ্রা।

এই স্থানে মোগলের মুকুট-রতন
শয়ান শান্তির মাঝে; পথিক সুজন
নেহারিয়া এ সমাধি ভক্তিপ্লুত মনে
সম্ভ্রমে নোয়ায় শির; হৃদয়-গগনে
ভাসে তার কত ছবি, কত পুণ্য কথা,
কত বরষের হায়, কত শত ব্যথা!
মনে পড়ে অতীতের দিল্লী-দরবার,
মোগলের শত হর্ম্ম্য, সুষমা-আগার!
মনে পড়ে এই পথে এমনি সময়ে,
বীর যোদ্ধা অগণন উৎফুল্ল হৃদয়ে
চলে যেত অবিরাম; আর আজি হায়!
ভাঙ্গিতে এ নীরবতা ঝিল্লী ভয় পায়!
যে জন শয়ান হেথা অন্তিম শয্যায়,
কত রাজা মহারাজ তাঁহারি সভায়,
কল-সম্ভাষণে কত কহিত কাহিনী!
কাঁপাইত কতবীর গর্জ্জনে মেদিনী,
কত কবি ঝঙ্কারিয়া সুমধুর তান,
তুষিত নিয়ত কত মহাজন-প্রাণ!
সেই সভামাঝে নিত্য ফারিজী, ফজল,
বীরবল, টোডর মল,—অমাত্য সকল,
প্রকৃতি পুঞ্জের হিতে দিবসে নিশায়,
সমদর্শী সম্রাটের সঙ্গে থাকি হায়!

কত নীতি শুভকরী করিত রচনা,
প্রজাহিতে নৃপহিত করিয়া কামনা।
মোস্লেম-হিন্দুরে বাঁধি প্রেমের বন্ধনে,
প্রতিষ্ঠিত এক ক্ষেত্রে অভিন্ন পরাণে,
চেয়েছিল দেখিবারে যেই মহাজন,
সেকেন্দ্রা তাঁহার অস্থি করে'ছে ধারণ।
যদি কোন শুভদিনে বিধির বিধানে,
এই দুই মহাজাতি মিশে প্রাণে প্রাণে,
সেকেন্দ্রা, তোমার এই নীরব শ্মশান,
সে দিন ভারতে হবে নব তীর্থ-স্থান।

# পঞ্চামৃত।

## পরোপকার।

নদী কভু পান নাহি করে নিজ জল,
তরুগণ নাহি খায় নিজ নিজ ফল।
গাভী কভু নাহি করে নিজ দুগ্ধ পান,
কাষ্ঠ, দগ্ধ হ'য়ে করে পরে অন্ন দান।
স্বর্ণ করে নিজরূপে অপরে শোভিত,
বংশী করে নিজ স্বরে অপরে মোহিত।
শস্য জন্মাইয়া নাহি খায় জলধরে,
সাধুর ঐশ্বর্য্য শুধু পরহিত তরে।

## নিষ্ক্রিয় মানব।

অর্থ আছে, কপর্দ্দক নাহি করে ব্যয়,
বিদ্যা আছে, কারো সনে কথা নাহি কয়;
বুদ্ধি আছে, ব'সে থাকে, কাজ নাহি করে,
রূপ আছে, বদ্ধ থাকে গৃহের ভিতরে;
শক্তি আছে, নাহি করে পর-উপকার,
তেজঃ আছে, দাঁড়াইয়া দেখে অবিচার;
সে নর চিত্রিত এক ছবির মতন,
গতি নাই, বাক্য নাই, জড়, অচেতন।

## সিন্ধু ও বিন্দু।

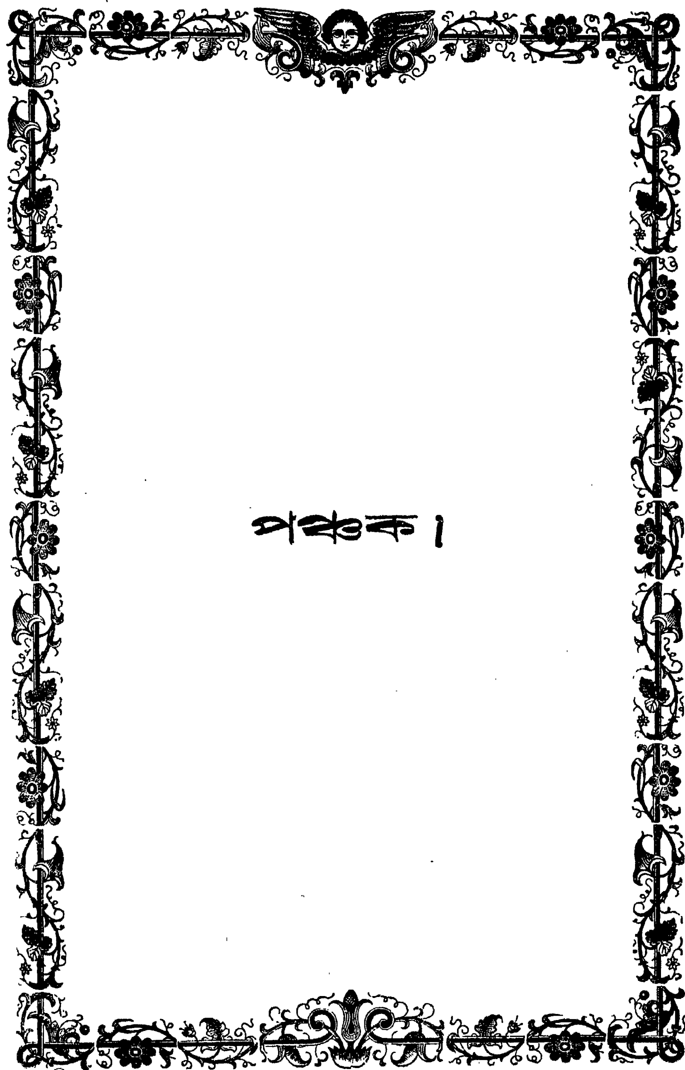
বিন্দু কহে, "সিন্ধু, তুমি অনন্ত, অপার,
আমি অতি ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, হেয় সবাকার।"
সিন্ধু কহে, "তুমি মম দেহ-প্রাণময়,
নহ তুচ্ছ, বিন্দু বিনা সিন্ধু কোথা হয়?"

## রবি ও শশী।

রবি কহে, "শশি, তুমি সুন্দর, উজ্জ্বল,
মম খরতাপে সদা দগ্ধ ধরাতল।
শশী কহে, "তুমি মম সৌন্দর্য্য-নিদান,
তোমারি কৃপায় আমি রম্য, জ্যোতিষ্মান্।"

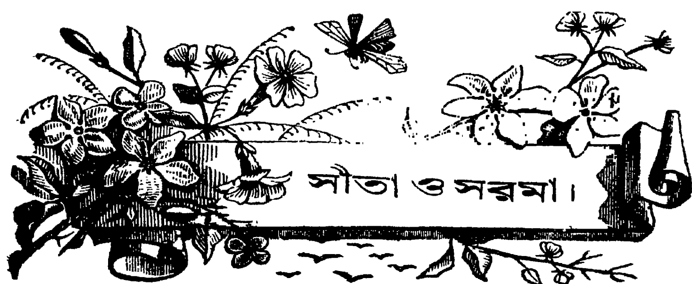
## সান্ত ও অনন্ত।

তটিনী সাগরে করে আত্মবিসর্জ্জন,
মহাকাশবক্ষে মিশি যায় সমীরণ;
মহাকালে লুপ্ত হয় বর্ষ, মাস, দিন,
নিয়ত অনন্তে সান্ত হ'তেছে বিলীন।



# পত্রক।






যথায় অশোক-বনে বসেন বৈদেহী,
অতল জলধিতলে, হায়রে, যেমতি
বিরহে কমলা সতী, আইল সরমা,—
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূবেশে।
বন্দি চরণারবিন্দ বসিল ললনা
পদতলে। মধুস্বরে সুধিলা মৈথিলী,—
"কহ মোরে বিধুমুখি, কেন হাহাকারে
এ দুদিন পুরবাসী? শুনিনু সভয়ে
রণ-নাদ সারাদিন কালি রণভূমে;
কাঁপিল সঘনে বন, ভূকম্পনে যেন
দূর বীর-পদ-ভরে; দেখিনু আকাশে
অগ্নি-শিখা সম শর; দিবা-অবসানে,
জয়নাদে রক্ষঃসৈন্য পশিল নগরে,
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য গম্ভীর নিক্বণে।
কে জিনিল? কে হারিল? কহ ত্বরা করি,
সরমে! আকুল মনঃ, হায়লো, না মানে

প্রবোধ ! না জানি, হেথা জিজ্ঞাসি কাহারে ?
না পাই উত্তর যদি সুধি চেড়ীদলে।
কহিলা সরমা সতী সুমধুর ভাষে,—
"তব ভাগ্যে ভাগ্যবতি ! হতজীব রণে
ইন্দ্রজিৎ। তেঁই লঙ্কা বিলাপে এরূপে
দিবানিশি। এতদিনে গতবল, দেবি !
কর্ব্বুর-ঈশ্বর বলী। কাঁদে মন্দোদরী ;
রক্ষঃকুল-নারীকুল আকুল বিষাদে ;
নিরানন্দ রক্ষোরথী। তব পুণ্যফলে
পদ্মাক্ষি, দেবর তব লক্ষ্মণ সুরথী
দেবের অসাধ্য কর্ম্ম সাধিলা সংগ্রামে,—
বধিলা বাসবজিতে,—অজেয় জগতে।"
উত্তরিলা প্রিয়ম্বদা,—"সুবচনী তুমি
মম পক্ষে, রক্ষোবধু ! সদা লো এ পুরে।
ধন্য বীর-ইন্দ্র-কুলে সৌমিত্রি কেশরী।
শুভক্ষণে হেন পুত্রে সুমিত্রা শাশুড়ী
ধরিলা সুগর্ভে, সই ! এতদিনে বুঝি
কারাগার-দ্বার মম খুলিলা বিধাতা
কৃপায়। একাকী এবে রাবণ দুর্ম্মতি
মহারথী লঙ্কাধামে। দেখিব কি ঘটে,—
দেখিব আর কি দুঃখ আছে এ কপালে।
কিন্তু শুন কাণ দিয়া। ক্রমশঃ বাড়িছে
হাহাকার ধ্বনি, সখি !" কহিলা সরমা
সুবচনী,—"কর্ব্বুরেন্দ্র রাঘবেন্দ্র সহ

করি সন্ধি, সিন্ধুতীরে লইছে তনয়ে
প্রেতক্রিয়াহেতু, সতি ! সপ্তদিবানিশি
না ধরিবে অস্ত্র কেহ এ রাক্ষস-দেশে
বৈরীভাবে ;—এ প্রতিজ্ঞা করিলা নৃমণি
রাবণের অনুরোধে ;—দয়াসিন্ধু, দেবি,
রাঘবেন্দ্র । দৈত্যবালা প্রমীলা-সুন্দরী—
বিদরে হৃদয়, সাধ্বি, স্মরিলে সে কথা,—
প্রমীলা-সুন্দরী ত্যজি দেহ দাহস্থলে,
পতির উদ্দেশে সতী, পতিপরায়ণা
যাবে স্বর্গপুরে আজি !
কাঁদিলা রাক্ষস-বধূ তিতি অশ্রুনীরে
শোকাকুলা । ভবতলে মূর্ত্তিমতী দয়া
সীতারূপে, পরদুঃখে কাতর সতত,
কহিলা,—সজল আঁখি সম্ভাষি সখীরে,
"কুক্ষণে জনম মম, সরমা রাক্ষসি !
সুখের প্রদীপ, সখি, নিবাইলো সদা
প্রবেশি যে গৃহে, হায়, অমঙ্গলরূপী
আমি । পোড়া ভাগ্যে এই লিখিলা বিধাতা
নরোত্তম পতি মম, দেখ, বনবাসী ।
বনবাসী, সুলক্ষণে, দেবর সুমতি
লক্ষ্মণ ! ত্যজিলা প্রাণ পুত্রশোকে, সখি,
শ্বশুর ! অযোধ্যাপুরী আঁধার লো এবে,
শূন্য রাজ-সিংহাসন ! মরিলা জটায়ু,
বিকট বিপক্ষ-পক্ষে, ভীম ভুজবলে,

রক্ষিতে দাসীর মান! হাদে দেখ হেথা,—
মরিল বাসবজিৎ অভাগীর দোষে,
আর রক্ষোরথী যত কে পারে গণিতে?
মরিবে দানব-বালা অতুলা এ ভবে
সৌন্দর্য্যে! বসন্তারম্ভে, হায়লো, শুকাল
হেন ফুল।" "দোষ তব?"—সুধিলা সরমা,
মুছিয়া নয়ন-জল,—"কহ কি, রূপসি?
কে ছিঁড়ি আনিল হেথা এ স্বর্ণ-ব্রততী
বঞ্চিয়া রসাল-রাজে? কে আনিল তুলি
রাঘব-মানস-পদ্ম এ রাক্ষস-দেশে?
নিজ কর্ম্মদোষে মজে লঙ্কা-অধিপতি!
আর কি কহিবে দাসী?" কাঁদিলা সরমা
শোকে! রক্ষঃ-কুল শোকে সে অশোক-বনে,
কাঁদিলা রাঘব-বাঞ্ছা দুঃখী পরদুঃখে।

---

# পরশমণি।

১

কে বলে পরশমণি অলীক স্বপন ?
অই যে অবনীতলে পরশ-মাণিক জ্বলে,
বিধাতা-নির্ম্মিত চারু মানব-নয়ন।
পরশ-মণির সনে লৌহ-অঙ্গ পরশনে
সে লৌহ কাঞ্চন হয়, প্রবাদ-বচন ;
এ মণি পরশে যায়, মাণিক ঝলসে তায়,
বরিষে কিরণ-ধারা নিখিল ভুবন।
কবির কল্পিত নিধি, মানবে দিয়াছে বিধি,
ইহার পরশ-গুণে মানব-বদন
দেবতুল্য রূপ ধরি আছে ধরা আলো করি,
মাটির অঙ্গেতে মাখা সোণার কিরণ !

২

পরশ-মাণিক যদি অলীক হইত,
কোথা বা এ শশধর, কোথা বা ভানুর কর,
কোথা বা নক্ষত্র-শোভা গগনে ফুটিত !
কে রাখিত চিত্র ক'রে চাঁদের জ্যোৎস্না ধ'রে,
তরঙ্গ মেঘের অঙ্গে সুখেতে মাখায়ে ?
কেবা এই সুশীতল বিমল গঙ্গার জল
ভারত-ভূষণ করি' রাখিত ছড়ায়ে ?
কে দেখাত তরুকুল, নানা রঙ্গে নানা ফুল,
মরাল, হরিণ, মৃগে পৃথিবী শোভিয়া ?
ইন্দ্রধনু আলো তু'লে, সাজায়ে বিহঙ্গ-কুলে
কে রাখিত শিখিপুচ্ছে শশাঙ্ক আঁকিয়া ?

৩

দিয়েছে বিধাতা যাই এ পরশমণি
স্বর্গের উপমাস্থল হয়েছে এ মহীতল,
সুখের আকর তাই হয়েছে ধরণী !
কি আছে ধরণী-অঙ্গে, নয়ন-মণির সঙ্গে,
না হয় মানব-চিত্তে আনন্দদায়িনী !
নদী-জলে মীন খেলে, বিটপীতে পাতা হেলে,
চরেতে বালুকা ফুটে, তৃণেতে হিমানী ;
পক্ষী-পাখা উড়ে যায়, পিপীলি শ্রেণীতে ধায়,
কঙ্করে তুষার পড়ে, ঝিনুকে চিক্কণী !
তা'তেও আনন্দ হয়, অরণ্য কুজ্ঝটিময়,
জ্বলন্ত বিদ্যুৎলতা, তমিস্রা রজনী।

৪

অপূর্ব্ব মাণিক এই পরশ-কাঞ্চন,
স্নেহরূপ কতফুল ফুটায় মণি অতুল,
ইহার পরশে ধরা আনন্দ-কানন।
জননী-বদন-ইন্দু জগতে করুণা-সিন্ধু,
দয়াল পিতার মুখ, মানস-মোহন !
শতশশি-রশ্মি মাখা চারু ইন্দীবর আঁকা,
পুত্রের অধর-ওষ্ঠ, নলিন-আনন,
সোদরের সুকোমল স্বস্থমুখ নিরমল,
পবিত্র প্রণয়-পাত্র গৃহীর কাঞ্চন,—
এই মণি-পরশনে হয় সুখ-দরশনে
মানব-জনম সার, সফল জীবন,
কে বলে পরশমণি অলীক স্বপন ?

# ব্রিটিশ রাজলক্ষ্মী।

১

দিবা অবসান-প্রায়, নিদাঘ ভাস্কর
বরষি' অনলরাশি, সহস্র কিরণ
পাতিয়াছে, বিশ্রামিতে ক্লান্ত কলেবর,
দূর তরুরাজি-শিরে স্বর্ণ-সিংহাসন।
খচিত সুবর্ণ-মেঘে সুনীল গগন
হাসিছে উপরে ; নীচে নাচিছে রঙ্গিণী
চুম্বি' মৃদু কলকলে মন্দ সমীরণ,
তরল সুবর্ণময়ী গঙ্গা তরঙ্গিণী।
শোভিছে একটী রবি পশ্চিম গগনে,
ভাসিছে সহস্র রবি জাহ্নবী-জীবনে।

২

শিবির-অনতিদূরে বসি' তরুতলে
নীরবে ক্লাইব, মগ্ন গভীর চিন্তায়।
চিন্তা-অবসন্ন মনে কিছুক্ষণ পরে,
নিমীলিত নেত্রে পুনঃ বসিলা আসনে ;
সবিস্ময়ে সেনাপতি দেখিলা অমনি,
জ্যোতির্ম্মিমণ্ডিতা এক অপূর্ব্ব রমণী।
ঝলসিছে শীর্ষোপরি কিরীট উজ্জ্বল,
নির্ম্মিত জ্যোতিতে, জ্যোতির্ম্মালায় খচিত ;
জ্যোতিরত্নে অলঙ্কৃত, জ্যোতিই সকল,
জ্বলিছে, হাসিছে জ্যোতিঃ চিরপ্রজ্বলিত।

৩

বিস্মিত ক্লাইবে চাহি, সস্মিত বদনে,
আরম্ভিলা সুরবালা,—"কি ভয়, বাছনি!
ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মী আমি, সুভাগিনী,
লক্ষ্মীকুল-লক্ষ্মী আমি, শুন বীরমণি!
এই হ'তে ইংলণ্ডের উন্নতি-নিয়তি;
এই সমুদিত মাত্র সৌভাগ্য-ভাস্কর।
মধ্যাহ্ন গৌরবে যবে ব্রিটন্‌-ভূপতি
উজলিবে দশদিক্‌, দেশ-দেশান্তর,
তাঁর ছত্র-ছায়াতলে, জানিবে নিশ্চিত,
অর্দ্ধ সসাগরা ধরা হবে আচ্ছাদিত।

"সোণার ভারতবর্ষে, বহুদিন আর
মহারাষ্ট্র, মোগল বা ফরাসি দুর্জ্জয়
করিবে না রক্তপাত, দ্বিতীয় বাবর
ভারতের রঙ্গভূমে হইয়া উদয়,
অভিনব রাজ্য নাহি করিবে স্থাপন;
কিংবা অতিক্রমি' দূর হিমাদ্রি-কান্তার,
দিল্লীর ভাণ্ডার-রাশি করিতে লুণ্ঠন,
ভীমবেগে দস্যুস্রোত আসিবেনা আর।
ভারতের ইতিহাসে উপস্থিত-প্রায়
অচিন্ত্য, অশ্রুত, এক অপূর্ব্ব অধ্যায়।

৫

"অনন্ত তুষারাবৃত হিমাদ্রি উত্তরে,
ওই দেখ উর্দ্ধশিরে পরশে গগন;—

অদ্রির উপরে অদ্রি, অদ্রি তদুপরে,
কটিতে জীমূতবৃন্দ করিছে ভ্রমণ।
দক্ষিণে অনন্ত, নীল, ফেণিল সাগর,
উর্ম্মির উপরে উর্ম্মি, উর্ম্মি তদুপরে,
হিমাদ্রির অভিমানে উন্মত্ত অন্তর,
তুলিছে মস্তক দেখ ভেদি' নীলাম্বরে।
অচল পর্ব্বতশ্রেণী শোভিছে উত্তরে,
চঞ্চল অচলরাশি ভাসে সিন্ধু 'পরে।

৬

"বেগবতী ঐরাবতী পূর্ব্ব সীমানায়,
পঞ্চভুজ সিন্ধুনদ বিরাজে পশ্চিমে ;
মধ্যদেশে, ওই দেখ, প্রসারিয়া কায়
শোভে যে বিস্তৃত রাজ্য রঞ্জিত রক্তিমে,
বিংশতি ব্রিটন নাহি হবে সমতুল।
ওই যে উড়িছে উচ্চ অট্টালিকা-শিরে
ব্রিটিশ-পতাকা যেন গৌরবে হেলায়,
খেলিছে পবন সনে অতি ধীরে ধীরে,
তুমিই তুলিয়া সেই জাতীয় কেতন
ভারতে ব্রিটিশরাজ্য করিবে স্থাপন।"

৭

"শতেক বৎসর রাজ-বিপ্লবের পরে
ইংলণ্ডের সিংহাসন হইবে অচল :
উদিবে যে তীব্র রবি ভারত-অম্বরে
ভাতিবে ধবলগিরি, সমুদ্রের তল।

কঙ্কালাবশিষ্ট পূর্ব্ব নৃপতি সকল
ঘুরিবে বেষ্টিয়া সৌর উপগ্রহ মত,
আশু রাহুগ্রস্ত হ'য়ে দুর্দ্দান্ত মোগল,
ছায়া কিংবা স্বপ্নে শেষে হবে পারগত
বিক্রমে শার্দ্দূল, মেষ, অহিংস অন্তরে
নির্ভয়ে করিবে পান একই নির্ঝরে।"

৮

"ধর, বৎস! এই ন্যায়পরতা-দর্পণ
বিধিকৃত, ব্রিটিশের রাজ্য-নিদর্শন।
যতদিন পূর্ব্বরাজ্যে ব্রিটিশ-শাসন
থাকিবে অপক্ষপাতী বিশদ এমন,
তত দিন এই রাজ্য হইবে অক্ষয়।"

"রাজার উপরে রাজা, রাজরাজেশ্বর,
জেতার উপরে জেতা, জিতের সহায়;
আছেন উপরে বৎস! অতি ভয়ঙ্কর!
দয়ালু, অপক্ষপাতী, মূর্ত্তিমান ন্যায়।
তাঁর রবি, শশী, তারা নক্ষত্র-মণ্ডলে
সমভাবে দেয় দীপ্তি ধনী ও নির্ধনে;
সমভাবে, সর্ব্বদেশে শ্বেতে ও শ্যামলে
বরষে তাঁহার মেঘ, বাঁচায় পবনে।
পার্থিব উন্নতি নহে পরীক্ষা কেবল,
সম্মুখে ভীষণ, বৎস, গণনার স্থল।"

# ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারী।

গান্ধারী—তবে আজ রাজ-পদতলে
সমস্ত নারীর হ'য়ে নয়নের জলে
বিচার প্রার্থনা করি। পুত্র দুর্য্যোধন
অপরাধী, প্রভো! তুমি আছ, হে রাজন্,
প্রমাণ আপনি! পুরুষে পুরুষে দ্বন্দ্ব
স্বার্থ ল'য়ে বাধে অহরহ,—ভাল মন্দ
নাহি বুঝি তার,—দণ্ডনীতি, ভেদনীতি,
কূটনীতি কত শত,—পুরুষের রীতি
পুরুষেই জানে! বলের বিরোধে বল,
ছলের বিরোধে কত জে'গে উঠে ছল,
কৌশলে কৌশল হানে,—মোরা থাকি দূরে
আপনার গৃহকর্ম্মে শান্ত অন্তঃপুরে।
যে সেথা টানিয়া আনে বিদ্বেষ-অনল
যে সেথা টানিয়া আনে বিদ্বেষ-অনল
বাহিরের দ্বন্দ্ব হ'তে, পুরুষেরে ছাড়ি
অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া নিরুপায় নারী
গৃহধর্ম্মচারিণীর পুণ্য দেহ'পরে
কলুষ-পরুষস্পর্শে অসম্মানে করে
হস্তক্ষেপ, পতি সাথে বাঁধায়ে বিরোধ
যে নর পত্নীরে হানি লয় তার শোধ,
সে শুধু পাষণ্ড নহে, সে যে কাপুরুষ,
মহারাজ! কি তার বিধান? অকলুষ
পুরুবংশে পাপ যদি জন্মলাভ করে
সেও সহে,—কিন্তু প্রভো, মাতৃগর্ব্বভরে

ভেবেছিনু গর্ভে মোর বীর পুত্রগণ
জন্মিয়াছে, হায় নাথ, সে দিন যখন
অনাথিনী পাঞ্চালীর আর্ত্ত কণ্ঠরব
প্রাসাদ পাষাণ-ভিত্তি করি দিল দ্রব,
লজ্জা-ঘৃণা-করুণার তাপে ছুটি গিয়া
হেরিনু গবাক্ষে, তার বস্ত্র আকর্ষিয়া
খল খল হাসিতেছে সভামাঝখানে
গান্ধারীর পুত্র পিশাচেরা, ধর্ম্ম জানে,
সে দিন চূর্ণিয়া গেল জন্মের মতন
জননীর শেষ গর্ব্ব। কুরুরাজগণ!
পৌরুষ ছাড়িয়া গেছে কোথায় ভারত।
তোমরা, হে মহারথি, জড়মূর্ত্তিবৎ
বসিয়া রহিলে সেথা চাহি মুখে মুখে,
কেহবা হাসিল, কেহ করিল কৌতুকে
কাণাকাণি,—কোষমাঝে নিশ্চল কৃপাণ,
বজ্রনিঃশেষিত লুপ্ত বিদ্যুৎ সমান
নিদ্রাগত। মহারাজ, শুন মহারাজ,
এ মিনতি। দূর কর জননীর লাজ,
বীরধর্ম্ম করহ উদ্ধার, পদাহত
সতীত্বের ঘুচাও ক্রন্দন,—অবনত
ন্যায়ধর্ম্মে করহ সম্মান, ত্যাগকর
দুর্য্যোধনে।

ধৃতরাষ্ট্র—পরিতাপ-অনলে জর্জ্জর
হৃদয়ে করিছ শুধু নিষ্ফল আঘাত
হে মহিষি!

গান্ধারী—শতগুণ বেদনা কি, নাথ,
লাগিছে না মোরে! প্রভো, দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার! যার তরে প্রাণ
কোন ব্যথা নাহি পায়, তারে দণ্ডদান
প্রবলের অত্যাচার! যে দণ্ড-বেদনা
পুত্রেরে পার না দিতে, সে কারে দিয়োনা,—
যে তোমার পুত্র নহে, তারো পিতা আছে,
মহা অপরাধী হবে তুমি তার কাছে
বিচারক! শুনিয়াছি বিশ্ব-বিধাতার
সবাই সন্তান মোরা,—পুত্রের বিচার
নিয়ত করেন তিনি আপনার হাতে
নারায়ণ; ব্যথা দেন, ব্যথা পান সাথে,
নতুবা বিচারে তাঁর নাই অধিকার,—
মূঢ় নারী লভিয়াছি অন্তরে আমার
এই শাস্ত্র! পাপী পুত্রে ক্ষমা কর যদি
নির্ব্বিচারে, মহারাজ, তবে নিরবধি
যত দণ্ড দিলে তুমি যত দোষী জনে
ফিরিয়া লাগিবে আসি দণ্ডদাতা ভূপে,
ন্যায়ের বিচার তব নির্ম্মমতারূপে
পাপ হ'য়ে তোমারে দাগিবে। ত্যাগকর
দুর্য্যোধনে।

---

# বঙ্গভূমি।

১

প্রণমি তোমারে আমি সাগর-উত্থিতে,
ষড়ৈশ্বর্য্যময়ি, অয়ি জননী আমার !
তোমার শ্রীপদ-রজঃ এখনো লভিতে
প্রসারিছে করপুট ক্ষুব্ধ পারাবার।

২

শতশৃঙ্গ-বাহু তুলি' হিমাদ্রি,—শিয়রে
করিছেন আশীর্ব্বাদ,—স্থির নেত্রে চাহি ;
শুভ্র মেঘ-জটাজাল দুলে বায়ুভরে,
স্নেহ-অশ্রু শতধারে ঝরে বক্ষ বাহি'।

৩

জ্বলিছে কিরীট তব নিদাঘ-তপন,
ছুটিতেছে দিকে দিকে দীপ্তরশ্মি-শিখা ;
জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠে শুষ্ক কাশ-বন,
নদীতটে বালুকার সুবর্ণ-কণিকা।

৪

গভীর সুন্দর-বনে তুমি শ্যামাঙ্গিনী,
বসি' স্নিগ্ধ বট-মূলে,—নেত্র নিদ্রাকুল !
শিরে ধরে ফণাচ্ছত্র কাল-ভুজঙ্গিনী,
অবলেহে পা-দুখানি আগ্রহে শার্দ্দূল।

নব বরষার চূর্ণ জলদ-কুন্তল,
উড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে শ্রীমুখ আবরি'।
চাতকী ডাকিছে দূরে, শিখিনী চঞ্চল,
মেঘমন্দ্রে কৃষকের চিত্ত যায় ভরি'।

৬

বিস্তীর্ণ পদ্মার তুমি ভগ্ন উপকূলে
ব'সে আছ মেঘস্তূপে অসিত-বরণা,
নক্রকুল নত তুণ্ডে পড়ি' পদমূলে,
তুলি' শুণ্ড করিযূথ করিছে বন্দনা।

৭

সরে মেঘ, ফুটে ধীরে বদন-চন্দ্রমা।
বিভোর চকোর উড়ে নয়ন-সোহাগে;
লুটে ভূমে শ্রীঅঙ্গের শ্যামল সুষমা,
চরণ-অলক্ত-রাগ তড়াগে তড়াগে।

৮

মূর্ত্তিমতী হ'য়ে সতি! এস ঘরে ঘরে,
রাখ ক্ষুদ্র কপর্দ্দকে রাঙ্গা পা-দুখানি।
ধান্য-শীর্ষ স্বর্ণ ঝাঁপি লও রাঙ্গা করে,—
ভুলে' যাই সর্ব্ব দৈন্য, সর্ব্ব দুঃখ-গ্লানি।

৯

ছুটি নবোৎসাহে মাঠে ল'য়ে গাভীদলে,
হিমসিক্ত তৃণভূমি, শুষ্ক পদ্মদল;
হরিদ্র ধান্যের ক্ষেত্রে, পীত রৌদ্রতলে,
বিছায়ে দিয়েছ তব সুবর্ণ অঞ্চল।

১০

কুজ্ঝটি সায়াহ্নে হেরি মৃগযূথ সাথে
ছুটিছ নির্ঝর-তীরে চকিতা চঞ্চলা।
মদির মধুক-বনে ম্লান জ্যোৎস্না-রাতে
ল'য়ে তুমি ঋক্ষ-শিশু ক্রীড়ায় বিহ্বলা!

১১

নিস্তব্ধ অরণ্যানী-চূড়ে সান্দ্র অন্ধকার,
কণ্টকী লতায় গেছে গিরিভূমি ভরি';
গহ্বরে গহ্বরে বন্য-বরাহ-ঘুৎকার,
বহিছে উত্তর-বায়ু শিহরি' শিহরি।

১২

হেরি, তুমি সাশ্রুনেত্রে অবনত শিরে,
পরিত্যক্ত গ্রামে গ্রামে ভ্রমিছ দুঃখিনী!
ভগ্নস্তূপে, শিলাখণ্ডে, বিনষ্ট মন্দিরে
খুঁজিছ পুত্রের কীর্ত্তি,—অতীত কাহিনী।

১৩

অশোকে কিংশুকে গেছে ছাইয়া প্রান্তর,
পিককণ্ঠ-কলতান উঠে দিকে দিকে;
চূত-মুকুলের গন্ধে মরুত মন্থর;
এস হৃৎ-পদ্মাসনে, সর্ব্বার্থ-সাধিকে।

১৪

এস চণ্ডিদাস-গীতি, শ্রীচৈতন্য-প্রীতি;
রঘুনাথ-জ্ঞানদীপ্তি, জয়দেব-ধ্বনি,
প্রতাপ-কেদার-বাঞ্ছা, গণেশ-সুকৃতি,
মুকুন্দ-প্রসাদ-মধু-বঙ্কিম-জননী!

